اللغة البنغالية

সালাতে গমনের আদব

লেখক:

শাইখুল ইসলাম , অন্যতম জ্ঞানী
অন্যতম জ্ঞানী, ইমাম ও মুজাদ্দিদ শাইখ
মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওহাহ্হাব
-उनपर अल्लाह की कृपा होরহিমাহুল্লাহু তা'আলা-
1115 - 1206

Islamhouse.com

সালাতের উদ্দেশ্যে হাঁটার আদব

লেখক: শাইখুল ইসলাম, অন্যতম জ্ঞানী, ইমাম ও মুজাদ্দিদ শাইখ

মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওহাহহাব

রহিমাহুল্লাহু তা‘আলা

সৌদি গ্রন্থাগারের ২৬৯/ ৮৬ নং এ সংরক্ষিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য কতিপয় প্রকাশিত সংস্করণের মধ্য হতে কিতাবটিকে বিশুদ্ধকরণ ও তুলনামুলক পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন তারা হলেন: আব্দুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ আল-লাহিম, নাসির ইবন আব্দুল্লাহ আত-তুবাইম এবং সা'উদ ইবন মুহাম্মাদ আল-বাশার।

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নাম

شركاء التنفيذ:

دار الإسلام　جمعية الربوة　رواد الترجمة　المحتوى الإسلامي

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.

Telephone: +966114454900
ceo@rabwah.sa
P.O.BOX: 29465
RIYADH: 11557
www.islamhouse.com

পরিচ্ছেদ: সালাতের উদ্দেশ্যে হাঁটার আদাব

বিনয়ের সাথে পবিত্র অবস্থায় সালাতের দিকে গমন করা সুন্নাত। যেহেতু রাসূলুল্লাহ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***"যখন কোনো ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযূ করে তারপর সে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে যেন তার আঙ্গুলগুলো একটির মাঝে অপরটি প্রবেশ না করায়। কারণ সে তখন সালাতেই থাকে।"*** এবং যখন সে বাড়ী হতে বের হবে—যদিও সালাত ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে বের হয়—তখন সে বলবে:

بسم الله آمنت بالله ، اعتصمت بالله ، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل أو أَزل أو أُزل أو أَظلم أو أُظلم أو أَجهل أو يُجهل علي

"আল্লাহর নামে শুরু করলাম। আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, আল্লাহকেই আঁকড়ে ধরেছি আর আল্লাহর উপরেই নির্ভর করেছি। আল্লাহর পক্ষ হতে আসা ব্যতীত কোনো সাহায্য ও শক্তি নেই। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন আমি কাউকে পথভ্রষ্ট না করি আর নিজেও পথভ্রষ্ট না হই, আমি যেন কাউকে বিচ্যুত না করি আর নিজেও বিচ্যুত না হই। আমি কারো উপরে জুলুম না করি আর আমিও যেন জুলুমের শিকার না হই। আর আমি যেন কাউকে অজ্ঞতার মধ্যে নিক্ষেপ না করি আর নিজেও অজ্ঞতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত না হই।"

এবং শান্তচিত্তে ও ভাব-গাম্ভীর্য সহকারে সালাতের জন্যে হেঁটে যাবে। যেহেতু রসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***"যখন তোমরা ইকামাত শুনতে পাবে, তখন তোমরা এমন অবস্থায় হেঁটে যাবে যে, তোমাদের ওপর শান্তচিত্তভাব রয়েছে। এরপরে সালাতের যেটুকু পাবে আদায় করবে আর যা ছুটে যাবে তা কাযা করবে।"*** সে তার পা কাছাকাছি ফেলবে আর বলবে:

اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি তোমার নিকট প্রার্থনাকারীদের তোমার উপরে যে হক রয়েছে তার মাধ্যমে, আর আমার এ গমনের হকের মাধ্যমে। যেহেতু কোনো গৌরব, অহংকার, লোক দেখানো অথবা প্রসিদ্ধি লাভের কারণে আমি বের হইনি। আমি বের হয়েছি তোমার অসন্তুষ্টির ভয়ে এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায়। (তাই) আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, তুমি জাহান্নাম থেকে আমাকে রক্ষা করো এবং আমার সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করো। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই।" এবং এরপরে বলবে:

اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً واجعل في بصري نوراً وفي سمعي نوراً وأمامي نوراً وخلفي نوراً وعن يميني نوراً وعن شمالي نوراً وفوقي نوراً وتحتي نوراً اللهم أعطني نوراً

"হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে নূর দান কর, আমার জিহ্বায় নূর দান কর, আমার দৃষ্টিতে নূর দান কর, আমার শ্রবণে নূর দান কর, আমার সামনে নূর দান

কর, আমার পিছনে নূর দান কর, আমার ডানে নূর দান কর, আমার বামে নূর দান কর, আমার উপরে নূর দান কর, আমার নিচে নূর দান কর। হে আল্লাহ! আমাকে নূর প্রদান কর।’’

আর যখন সে মসজিদে প্রবেশ করবে তখন তার জন্য ডান পা আগে দেওয়া এবং এ কথা বলা মুস্তাহাব:

بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك

“আল্লাহর নামে, আমি মহান আল্লাহর কাছে, তাঁর সম্মানিত চেহারা ও তাঁর প্রাচীন রাজত্বের উসিলায় বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন আর আমার পাপসমূহকে ক্ষমা করে দিন। এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।” এবং বের হওয়ার সময়ে বাম পা আগে দিবে এবং বলবে:

وافتح لي أبواب فضلك

“আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন।”

যখন সে মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন দুই রাকআত [তাহিয়্যাতুল মসজিদ] সালাত আদায় না করে বসবে না; কারণ, রাসূলুল্লাহ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেন: ***“যখন তোমাদের কেউ মসজিদ প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দুই রাক‘আত সালাত না পড়া পর্যন্ত না বসে।”*** এবং সে আল্লাহর যিকির নিয়ে মশগুল হবে অথবা চুপ থাকবে। দুনিয়াবী কোনো কথায় মশগুল হবে না। যতক্ষণ সে এমনভাবে থাকবে, ততক্ষণ সে সালাতের মধ্যেই গণ্য হবে। আর

ফেরেশতারা তার ক্ষমার জন্য দুয়া করতে থাকবে যতক্ষণ না সে কষ্ট দেয় অথবা অপবিত্র হয়ে পড়ে।

পরিচ্ছেদ: সালাতের পদ্ধতি

এটা মুস্তাহাব যে, সে যখন মুয়াজ্জিনকে “কাদ কা-মাতিস সালাহ” বলতে শুনবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে, যদি ইমাম মসজিদে থাকে নতুবা যখন ইমামকে দেখা যাবে। ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: তাকবীরের আগে কিছু বলবে? তিনি বলেছেন: না, যেহেতু নাবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** থেকে এ মর্মে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি, আর তাঁর কোনো সাহাবী থেকেও নয়। তারপরে ইমাম কাঁধ ও গোড়ালীসমূহ বরাবর করে কাতার সোজা করে দেবেন।

সুন্নাত হলো, প্রথম কাতার, তারপর ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী কাতারগুলো পূর্ণ করা, মুক্তাদিগণ একে অপরের সাথে চেপে দাঁড়ানো, কাতারের ফাঁকাস্থান বন্ধ করা এবং প্রতিটি কাতারের ডানে দাঁড়ানো উত্তম। ইমামের নিকটে দাঁড়ানোও উত্তম। যেহেতু আল্লাহর রাসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***“তোমাদের মধ্যে সাবালগ ও বুদ্ধিমানেরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে।”*** পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার, আর শেষ কাতার হচ্ছে অনুত্তম। আর মহিলাদের জন্য সর্বশেষ কাতার সর্বোত্তম আর প্রথমটি অনুত্তম। দাঁড়াতে সক্ষম হলে দাঁড়িয়ে বলবে:

" الله أكبر "

(আল্লাহু আকবার), এটা ছাড়া অন্য কোনো কিছু বলা যথেষ্ট হবে না।

"الله أكبر "

(আল্লাহু আকবার) দ্বারা সালাত শুরু করার হিকমাত হচ্ছে: মুসল্লী যার সামনে দাঁড়াচ্ছে তার বড়ত্ব ও মহত্ব যেন তার কাছে উপস্থিত হয়, আর এতে যেন সে ভীত হয়। যদি

" الله "

এর হামযাহ টেনে পড়ে, অথবা

"أكبر"

এর হামযাহ টেনে পড়ে, অথবা বলে:

" إكبار "

তবে তা দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা গৃহীত হবে না। বোবা ব্যক্তি তার জিহ্বা না নাড়িয়েই অন্তরে বা মনে মনে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। অনুরূপ তার জন্য কিরাআত, তাসবীহ ও অন্যান্য ব্যাপারেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ইমামের জন্য জোরে তাকবীর বলা সুন্নাত। যেহেতু **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম** বলেছেন: ***"যখন ইমাম তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বল।"*** তাসমী' (সামি'আল্লাহু লি মান হামিদা)ও সরবে বলা সুন্নাত। যেহেতু তিনি বলেছেন: ***"যখন সে বলবে:***

سمع الله لمن حمده

অর্থ "আল্লাহ শ্রবণ করেছেন, যে তার প্রশংসা করেছে" তখন তোমরা বলো:

ربنا ولك الحمد

"হে আমাদের রব, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা।"

মুক্তাদী ও একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তি এটা আস্তে বলবে। আর সে আঙ্গুলগুলো লম্বা করে মিলিয়ে রেখে তার দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করবে, এ সময়ে হাতের তালুদ্বয় কিবলামুখী থাকবে, যদি কোনো ওযর না থাকে। আর হাত দু'টি তার ও তার রবের মধ্যকার পর্দা উন্মুক্ত করার দিকে ইশারা করে উত্তোলন করবে। যেমনভাবে শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারাতে আল্লাহর তাওহীদকে বোঝায়। তারপরে সে তার ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের কবজি ধরে তার নাভীর নিচে রাখবে। এর অর্থ হচ্ছে স্বীয় রব আয্যা ওয়া জাল্লা এর সামনে তার হীনতা প্রকাশ করা। সালাতের পুরো সময়ে সকল অবস্থাতে সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা মুস্তাহাব; তবে তাশাহহুদের সময় ব্যতীত, তাশাহহুদের সময়ে শাহাদাত আঙুলের দিকে তাকাবে। তারপরে অনুচ্চ আওয়াজে

“سبحانك اللهم وبحمدك ”

বলবে। এখানে

سبحانك اللهم

শব্দের অর্থ: আমি আপনার সম্মান ও মর্যাদার উপযোগী পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ।

وبحمدك

শব্দের অর্থ: বলা হয়েছে: আমি আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা একই সাথে বর্ণনা করছি।

وتبارك اسمك

তথা এমন বরকত যা আপনার স্মরণে অর্জিত হয়।

وتعالى جدك

তথা: আপনার সম্মান বুলন্দ হোক।

ولا إله غيرك

তথা আসমান কিংবা যমীনে আপনি ছাড়া আর কোনো প্রকৃত মা'বূদ নেই, হে আল্লাহ! এছাড়া অন্যান্য সানা যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- তা দ্বারা সালাত শুরু করা জায়িয। এরপরে নিরব আওয়াজে বলবে:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

"আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।" বর্ণিত দোয়াসমূহ থেকে যার দ্বারাই আশ্রয় প্রার্থনা করা হোক তা ভালো।

﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾[الفاتحة:1]

তারপরে আস্তে বিসমিল্লাহ বলবে। তবে বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার আয়াত নয়, তবে কুরআনের একটি আয়াত, যা ফাতিহার শুরুতে এবং প্রতি দুই সূরার মাঝখানে রয়েছে; শুধু সূরা তাওবাহ ও আনফালের মাঝখান ছাড়া। বই-পত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা সুন্নাত, যেমন সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার পত্রের শুরুতে লিখেছেন এবং নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** যেমনটি করতেন। এটি প্রতিটি কাজের শুরুতে উল্লেখ করা হয়; কেননা এটি শয়তানকে বিদূরিত করে। ইমাম আহমাদ বলেছেন: কবিতার শুরুতে অথবা কবিতার সাথে বিসমিল্লাহ লিখবে না। তারপরে সূরা ফাতিহা তারতীবসহ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সুন্দরভাবে পাঠ করবে। এটি প্রতিটি রাকাতের একটি রুকন, যেমন হাদীসে এসেছে: ***"যে ব্যক্তি ফাতিহাতুল কিতাব পড়ল না তার সালাত নেই।"*** এটিকে উম্মুল কুরআন বলা হয়। কেননা এতে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত

এবং তাকদীরের বর্ণনা রয়েছে। প্রথম দুই আয়াত তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত দেয়, এবং

﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ﴾[الفاتحة:4]

এ আয়াতটি আখিরাতের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। "আমরা শুধু আপনারই 'ইবাদাত করি এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" এ আয়াত আদেশ, নিষেধ, তাওয়াক্কুল এবং ইখলাস সম্পূর্ণই আল্লাহর জন্য, এদিকে ইঙ্গিত করে। এ আয়াতে আরো সতর্কতা রয়েছে সৎপথ ও তার অধিকারী এবং এর অনুসারীদের ব্যাপারে।

আবার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার পথ সম্পর্কেও সতর্কতা রয়েছে। এটা মুস্তাহাব যে, মুসল্লী থামবে প্রতিটি আয়াতের পরে; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** এভাবেই কিরাআত পড়েছেন। এটি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা। আর কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী, এতে মোট এগারোটি তাশদীদ রয়েছে।

তাশদীদ ও মদ্দের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা মাকরূহ। সূরা ফাতিহা শেষে সামান্য একটু চুপ থেকে আমীন বলবে; যেন বোঝা যায় যে, এটি কুরআনের আয়াত নয়।

আমীনের অর্থ হচ্ছে: 'হে আল্লাহ, আপনি কবুল করুন', জেহরী সালাতে ইমাম ও মুকতাদী উভয়েই আমীন জোরে বলবে। এরপরে জেহরী সালাতে ইমামের জন্য কিছু সময় চুপ থাকা মুস্তাহাব; *যেমনটি সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে এসেছে। সূরা ফাহিতা না জানা ব্যক্তির উপর তা শিক্ষা করা আবশ্যক, যদি সক্ষমতা থাকার পরেও সে তা না করে,* তবে তার সালাত সহীহ হবে না। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় যে, সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের অন্য কোন আয়াতও সে জানে না, তবে সে বলবে:

" سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر "

যার অর্থ: "আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহরই, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়।" যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***"যদি তোমার সঙ্গে কুরআন থাকে, তবে তা পাঠ কর, আর না জানা থাকলে আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এবং আল্লাহু আকবার বলে তারপরে রুকু কর।"*** তিরমিযী ও আবূ দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন। এরপরে আস্তে বিসমিল্লাহ বলবে, তারপরে একটি পুরো সূরা পড়বে, একটি আয়াত হলেও যথেষ্ট হবে। তবে ইমাম আহমাদ লম্বা আয়াত হওয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। সালাতে না থাকলে ইচ্ছা করলে সে বিসমিল্লাহ জোরেও পড়তে পারে, ইচ্ছা করলে আস্তেও পড়তে পারে। ফজরের সালাতে তিওয়ালে মুফাসসাল (দীর্ঘ সূরা) হতে কিরাত পড়া উচিত, যার প্রথম সূরা হচ্ছে (কা-ফ), আউসের বর্ণনাতে এসেছে: আমি মুহাম্মাদ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কুরআনকে মোট কত ভাগে ভাগ করেন? তারা জবাব দিয়েছেন: তিন, পাঁচ, সাত, নয়, এগারো, তের, এবং মুফসসালের ভাগ একটি। আর ফজরের সালাতে সফর, অসুস্থতা ও অনুরূপ কোনো উযর ছাড়া কিছার (ছোট সূরা) থেকে তিলাওয়াত করা মাকরূহ।

মাগরিবের সালাতে সে কিছারে মুফাসসাল থেকে পড়বে এবং কখনো কখনো সে তিওয়ালে মুফাসসাল থেকেও পড়বে; কেননা নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** মাগরিবের সালাতে সূরা আল-আ'রাফ পড়েছেন। অন্যান্য সালাতে যদি কোন ওজর না থাকে, তবে আওসাতে মুফাসসাল থেকে পড়বে, আর যদি তা না হয় তবে কিছারে মুফাসসাল থেকে পড়বে। কোনো নারীর জন্য সালাতে শব্দ করে তেলাওয়াত করাতে কোনো সমস্যা নেই, যদি না কোনো ভিন পুরুষ তার আওয়াজ শুনতে পায়। আর রাতের বেলায় নফল সালাত আদায়কারী ব্যক্তি অন্যের সুবিধার দিকে খেয়াল রাখবে। যদি তার পাশে এমন কেউ থাকে যে, তার

উচ্চ আওয়াজ তাকে কষ্ট দিতে পারে, তবে সে আস্তে পড়বে। আর যদি এমন হয়ে থাকে যে কেউ তার তেলাওয়াত শুনতে চায়, তবে সে জোরে তেলাওয়াত করবে।

যদি কেউ জোরে কিরাআতের স্থানে আস্তে অথবা আস্তে কিরাআতের স্থানে জোরে কিরাআত শুরু করে, তবে সে ঐভাবেই কিরাআত সমাপ্ত করবে। আয়াতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব; যেহেতু তা নস দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়। আর সূরার তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়; যেহেতু তা ইজতিহাদের মাধ্যমে করা হয়েছে। এটি নসের মাধ্যমে নয়, এটিই অধিকাংশ আলিমদের মতামত। আর এ কারণেই এই সূরার আগে ঐ সূরা তেলাওয়াত করা জায়িয। এ জন্যই স্যাহাবীদের মাসাহিফে (সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা) লেখার ভিন্নতা ছিল। ইমাম আহমাদ (কারী) হামযাহ ও কিসাঈর কিরাআত এবং আবূ আমরের 'ইদগামে কাবীর' কে অপছন্দ করেছেন। কিরাআত থেকে ফারেগ হওয়ার পরে সামান্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাতের প্রথম রফ'উল ইয়াদাইনের (হাত উত্তোলন) ন্যায় পুনরায় রফ'উল ইয়াদাইন (হাত উত্তোলন) করবে।

কিরাআতের সাথে রুকুর তাকবীরকে মিলিয়ে ফেলবে না। সে তাকবীর বলবে। তারপরে তার দুই হাতের আঙ্গুলগুলোকে খোলাবস্থায় তার দুই হাঁটুর উপরে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখবে। পিঠকে সোজা করে রাখবে, আর মাথা তার বরাবর থাকবে, এর থেকে উঁচু বা নিচু কোনটিই করবে না। যেহেতু আয়েশার হাদীসে এমনটি এসেছে। সে তার দুই পার্শ্ব থেকে তার কনুই দুটিকে পৃথক রাখবে; যেহেতু আবূ হুমাইদের হাদীসে এমনটি এসেছে। আর সে রুকুতে বলবে:

' سبحان ربي العظيم'

যার অর্থ: 'আমি আমার মর্যাদাবান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।' যেহেতু হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে এটি এসেছে, যা মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

উত্তম হলো কমপক্ষে তিন বার বলবে। আর ইমামের জন্য তাসবীর সর্বোচ্চ পরিমাণ দশ বার। অনুরূপভাবে এই হুকুম সিজদাতে

‘سبحان ربي الأعلى’

যার অর্থ: ‘আমি আমার সর্বোচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি’ বলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা থাকায় রুকু অথবা সিজদাতে কোনো কিরাআত পাঠ করা যাবে না। এরপরে সে রুকু হতে মাথা উঠাবে এবং প্রথমবারের মত হাতদ্বয়ও উত্তোলন করে রাফ‘উল ইদাইন করবে, আর ইমাম ও মুনফারিদ ব্যক্তি বলবে:

‘ سمع الله لمن حمده’

যার অর্থ: ‘আল্লাহ তার প্রশংসা শুনেন, যে তার প্রশংসা করেন।’, এটি বলা হওয়াজিব। এখানে ‘শোনেন’ অর্থ: (দু‘আ) কবূল করেন। তারপরে পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে বলবে:

"ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد"

“হে আমাদের রব! সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই। আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং এরপরে আপনি যা চান সব কিছুই আপনার প্রশংসায় পরিপূর্ণ।” যদি সে ইচ্ছা করে, তবে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করতে পারবে:

"أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد"

“হে রব! আপনি প্রশংসা ও মর্যাদার পূর্ণ হকদ্বার। বান্দা যা বলে, তার থেকেও বেশী। আমরা প্রত্যেকেই আপনার বান্দা। আপনি যা দান করেন তাকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই, আপনি যা প্রতিরোধ করেন, তা দেওয়ার মত কেউ নেই।

আপনি ব্যতীত কোনো (সম্পদ ও সম্মানের) বিত্ত কোনো বিত্তশালীকে উপকার করতে পারে না।” বর্ণিত অন্যান্য দু‘আও সে করতে পারবে। আর সে ইচ্ছা করলে বলতে পারে:

اللهم ربنا لك الحمد

‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ’ ওয়াও বর্ণটি ছাড়া। যেহেতু এটি আবু সাঈদ ও অন্যান্য সাহাবীদের হাদিসে এসেছে। মুকতাদী ইমামকে যে রাকআতের রুকুর মধ্যে পাবে, তবে সে উক্ত রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। তারপরে তাকবীর বলবে এবং সিজদায় যাবে, আর সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাতকে উত্তোলন করবে না। সে তার হাঁটু দুটোকে রাখবে, তারপরে তার দুই হাতকে রাখবে, তারপর তার চেহারাকে। এবং সে তার কপাল, তার নাক এবং দুই হাতের তালুকে যমীনের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে রাখবে। আর তার পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা কিবলার দিকে ঘুরিয়ে রাখবে। আর এই সাতটি অঙ্গের উপরে সিজদা করা ফরয বা রুকন। আর সালাত আদায়কারীর জন্য এটা মুস্তাহাব যে, সে তার দুই হাতের তালুকে মাটিতে রেখে আঙ্গুলগুলোকে একসাথে রেখে কিবলার দিকে মুখ করে রাখবে। তবে তার কনুই দুটো আলাদাভাবে উঁচু অবস্থায় থাকবে।

আর অত্যন্ত গরম অথবা অত্যন্ত ঠান্ডা স্থানে সালাত আদায় করা মাকরুহ; কেননা তা মনোনিবেশ দূর করে দেয়। সিজদাকারীর জন্য এটা সুন্নাত যে, সে তার বাহুদ্বয়কে তার পার্শ্বদ্বয় থেকে আলাদা রাখবে, তার পেটকে তার দুই উরু থেকে আলাদা রাখবে এবং দুই উরুকে তার দুই পায়ের নলা দুটি থেকে আলাদা রাখবে। সে তার হাত দুটিকে কাঁধ বরাবর রাখবে, আর দুই পা ও দুই হাঁটুর মধ্যে ফাঁক রাখবে। তারপরে সে তাকবীর বলতে বলতে মাথা উঠাবে এবং পা বিছিয়ে বসবে অর্থাৎ তার বাম পা বিছিয়ে দিবে, এর উপর সে বসবে এবং ডান পা খাড়া করা অবস্থায় রাখবে এবং তার নিতম্বের নিচ থেকে তা বের করে তার আঙ্গুলগুলোর ভিতরের দিক যমীনের দিকে থাকবে, এমনভাবে যেন তাদের

মাথাগুলো কিবলামুখী হয়ে থাকে; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** সালাতের বর্ণনাতে আবু হুমাইদের হাদীসে এমনটি রয়েছে। সে তার হাত দুটিকে খোলাবস্থায় আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে রেখে তার উরুদ্বয়ের উপরে রাখবে। আর সে বলবে:

رب اغفر لي

“হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন।” তবে এর চেয়ে বৃদ্ধি করাতে কোনো দোষ নেই; যেহেতু ইবন আব্বাস বলেছেন: নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন:

"رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني "

“হে আমার রব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! আমাকে রহমত করুন! আমাকে হিদায়াত দিন! আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমাকে ক্ষমা করুন!” হাদীসটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। তারপরে সে প্রথম সিজদার ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা করবে, যদি চায় দু‘আ করতে পারবে; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***“আর সিজদাতে তোমরা বেশি বেশি দু‘আ করবে। কেননা, এটা তোমাদের দু‘আ কবুলের উপযুক্ত সময়।”*** মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি সিজদাতে বলতেন:

" اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره"

“হে আল্লাহ! তুমি আমার সকল ছোট ও বড়, পূর্বের ও পরের, প্রকাশ্য ও গোপনের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দাও।“ তারপরে সে তাকবীর বলতে বলতে দুই হাঁটুর উপরে ভর করে তার দুই পায়ের উপরে দাঁড়াবে; যেহেতু ওয়ায়েল

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসে এমনটি এসেছে, তবে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া অথবা অসুস্থতা অথবা দুর্বলতা থাকলে ভিন্ন কথা। তাকবীরে তাহরীমা ও সানা পড়া ব্যতীত দ্বিতীয় রাকাতও প্রথম রাকাতের ন্যায় আদায় করবে; যদিও সানা প্রথম রাকাতে না পড়ে থাকে। তারপরে তাশাহহুদের জন্য পা বিছিয়ে বসবে আর তার হাতদ্বয় তার উরুদ্বয়ের উপরে থাকবে। বাম হাতের আঙ্গুলগুলো একসাথে মিলিত অবস্থায় কিবলামুখী করে বিছানো থাকবে। আর ডান হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা আঙ্গুলদ্বয় মুষ্ঠিবদ্ধ অবস্থায় রেখে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি বৃত্তাবস্থায় রাখবে। তারপরে নিরবে তাশাহহুদ পড়বে, আর তার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা আল্লাহর তাওহীদের প্রতি ইশারা করবে, আর সালাতে অথবা তার বাইরেও দু‘আর সময়ে তা দ্বারা ইশারা করবে; যেহেতু ইবনু যুবাইর বলেছেন: ***নবী*** **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** ***দোয়ার সময় তার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন, তবে তা নাড়াতেন না। এটি আবু দাঊদ বর্ণনা করেছেন।*** তারপরে সে বলবে:

“التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ”

“সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ‘ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মা‘বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।” আর নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে কোনো তাশাহহুদ পড়লেই তা যথেষ্ট হবে। তবে সংক্ষেপ করা উত্তম। আর তাশাহহুদের পরে কোন কিছু বৃদ্ধি না করা। এটি হচ্ছে প্রথম তাশাহহুদ। যদি সালাত শুধুমাত্র দুই রাকাত হয়ে থাকে, নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** উপরে দরুদ পাঠ করবে,

‘اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد’

যার অর্থ: “হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের উপরে শান্তি বর্ষণ করুন যেভাবে আপনি ইবরাহীমের পরিবারের উপরে শান্তি বর্ষণ করেছেন; নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। এবং মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের উপরে বরকত নাযিল করুন, যেভাবে আপনি ইবরাহীমের পরিবারের উপরে বরকত নাযিল করেছেন; নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।” এছাড়াও হাদীসে বর্ণিত যে কোনো দরুদে পড়াও জায়েজ আছে। মুহাম্মাদের পরিবার হলো তাঁর আহলে বাইত। তার কথা:

"التحيات"

তথা সকল ধরনের মৌখিক ইবাদাত বা তাহিয়্যাহ আল্লাহর জন্যই, উপযুক্ততা ও মালিকানার কারণে।

"والصلوات"

তথা দু‘আসমূহ।

" والطيبات"

নেক আমলসমূহ। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার জন্য সালাম না দিয়ে তাহিয়্যাহ বা ইবাদাত করতে হবে; কেননা সালাম হচ্ছে দু‘আ। সালাত শব্দযোগে নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** ছাড়াও অন্যদের জন্য এককভাবে দু‘আ করা যাবে, যদি না তা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, অথবা কোনো মানুষের জন্য তা নিদর্শনের মত না হয়ে যায় অথবা কোনো সাহাবী বাদে অন্য সাহাবীদের উদ্দেশ্য করা হয়। নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** উপরে সালাতের বাইরেও দরুদ পড়া সুন্নাত; বরং তা অধিক থেকে অধিকতর

তাগিদপ্রাপ্ত একটি বিষয়, যখন তার নাম উল্লেখ করা হয় এবং জুমু‘আর দিনে এবং রাতে। আর এটি বলাও সুন্নাত:

“اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ”

“হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” আর যদি যা কিছু উল্লিখিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোনো দু‘আ করে, তবুও তা ভালো। যেহেতু আল্লাহর রাসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***“তারপরে সে তার কাছে পছন্দনীয় দু‘আকে বেছে নেবে।”*** যদি মুক্তাদীদের উপরে তা কঠিন হয়ে না যায়। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য দু‘আ করা জায়েজ; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** তাঁর দোয়ার মধ্যে মক্কাতে থাকা দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য এমনটি করেছেন। এরপর সে সালাম ফিরাবে। প্রথমে ডান দিকে সালাম দিবে এবং বলবে:

السلام عليكم ورحمة الله

“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” এরপরে বামদিকে অনুরূপ সালাম ফিরাবে, আর এতে মুখ ঘোরানো সুন্নাত। আর তার বাম দিকে বেশি পরিমাণে ঘোরাবে, যেন তার মুখমন্ডল দেখা যায়। আর ইমাম শুধুমাত্র প্রথম সালামটি জোরে বলবে, আর সে ছাড়া অন্য সকলে দুটি সালামকেই আস্তে বলবে। এটা সুন্নাত যে, সালাম দীর্ঘায়িত করবে না তথা এটা দ্বারা তার শব্দকে প্রলম্বিত করবে না। আর এর মাধ্যমেই সে সালাত থেকে বের হওয়ার নিয়ত করবে এবং একই সাথে সে নিয়ত করবে হেফাজতকারী ফেরেশতা এবং উপস্থিত লোকদেরকেও সালাম দেওয়ার। আর যদি সালাত দুই রাকাত অপেক্ষা বেশি হয়ে থাকে, তবে সে প্রথম তাশাহহুদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তার দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে

যাবে। আর তার বাকী সালাত সে পূর্বে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে সমাপ্ত করবে। তবে সে ব্যক্তি জোরে কিরাত পড়বে না এবং সূরা ফাতিহার পরে অন্য কিছু তেলাওয়াতও করবে না। তবে সে ফাতিহার সাথে সূরা পড়লেও মাকরুহ হবে না। এরপরে সে দ্বিতীয় তাশাহুদের জন্য তাওয়াররুক করে বসবে। তাওয়াররুক হচ্ছে: সে তার বাম পা বিছিয়ে দেবে আর ডান পা উঁচু করে রাখবে। আর তার দুই পা ডান দিক হতে বের করে দেবে, যাতে তার পশ্চাৎদেশ মাটির উপরে থাকে। এরপর সে প্রথমে তাশাহহুদ পড়বে এবং নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** উপর দরুদ শরীফ পড়বে, তারপরে দু'আ করবে এবং এরপরে সে সালাম ফিরাবে। ইমাম তার ডান দিক থেকে অথবা বাম দিক থেকে মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসবে। তবে সালামের পরে কিবলাহর দিকে মুখ করে ইমাম বেশিক্ষণ বসে থাকবে না। মুক্তাদীগণও তার আগে স্থান ত্যাগ করবে না; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***"নিশ্চয় আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং রুকু-সিজদা অথবা চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না।"*** আর যদি তাদের সাথে নারীরা সালাত পড়ে থাকে, তবে নারীরা চলে যাবে আর পুরুষেরা সামান্য কিছুক্ষণ বসে থাকবে; যেন তাদের কাউকে পুরুষেরা না দেখতে পায়। আর সালাতের পরে আল্লাহর যিকির করা, দু'আ করা, ইস্তেগফার করা হচ্ছে সুন্নত। এবং সে তিনবার বলবে: 'আস্তাগফিরুল্লাহ' এরপরে সে বলবে:

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনিই সালাম, এবং আপনার পক্ষ থেকেই সালাম বা শান্তি, আপনি মহাবরকতময়, সম্মান এবং ইজ্জতের অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁরই সকল

রাজত্ব। তাঁরই সকল প্রশংসা। আর তিনিই সকল কিছুর উপরে মহাশক্তিমান। এবং কোনো শক্তি এবং কোনো উপায় নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। আর আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নাই। আমরা আল্লাহর দীনের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা সহকারে তাঁর ইবাদত করি। তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদাতও করি না। সকল নিয়ামত তাঁরই, সকল অনুগ্রহ তারই, তারই সকল উত্তম প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। যদিও কাফেরগণ তা অপছন্দ করুক।”

" اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد"

“হে আল্লাহ আপনি যা নিষেধ করেন তা দেওয়ার মত কেউ নাই, আর আপনি যা প্রদান করেন তা নিষেধ করারও কেউ নাই। এবং আপনি ব্যতীত কোনো সম্পদ কোনো সম্পদশালীকে উপকার করতে পারে না।” তারপরে সে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর বলবে। প্রতিটি ৩৩ বার করে পড়বে, আর ১০০ পূরণের ক্ষেত্রে বলবে:

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"

তথা “আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।” আর কারো সাথে কথা বলার আগেই সে ফজরের সালাত এবং মাগরিবের সালাতের পরে সাতবার বলবে:

اللهم أجرني من النار

“আল্লাহ আপনি আমাকে আগুন থেকে রক্ষা করুন”। দু‘আর ক্ষেত্রে আস্তে দু‘আ করা উত্তম। অনুরূপভাবে কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত অন্যান্য দু‘আও আস্তে করা উত্তম। এটা হবে আদবের সাথে, খুশু সহকারে, আন্তরিকভাবে, আগ্রহ এবং ভীতি সহকারে; যেহেতু হাদীসে রয়েছে: “গাফেলের অন্তরের দু‘আ কবূল করা হয় না।”

আর সে আল্লাহর নামসমূহ এবং গুণাবলীর মাধ্যমে এবং আল্লাহর তাওহীদের মাধ্যমে উসিলা পেশ করবে, এবং সে দোয়া কবুলের সময়গুলো খুঁজতে থাকবে, আর সেগুলো হচ্ছে: রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে এবং প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আর জুম‘আহর দিন শেষ সময়ে। এবং সে দু‘আ কবুলের জন্য অপেক্ষা করবে, কোনো তাড়াহুড়া করবে না। তাড়াহুড়া হলো এ কথা বলা যে, আমি বারবার দু‘আ করেছি অথচ আমার দু‘আ কবুল হয়নি। এটা পছন্দনীয় নয় যে, সে তার নিজের জন্য বিশেষভাবে দু‘আ করবে, তবে তার সাথে যদি মানুষেরা আমীন বলতে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা (অর্থাৎ তখন সবাইকে শামীল করে দোয়া করবে)। দু‘আর ক্ষেত্রে উচ্চস্বরে দু‘আ করা অপছন্দনীয়। সালাতের মধ্যে সামান্য এদিকে-ওদিকে তাকানো, আকাশের দিকে তাকানো, দাঁড়ানো ছবির দিকে অথবা কোনো মানুষের মুখের দিকে ও কোন আগুনের দিকে -যদিও তা বাতি হয়ে থাকে- সালাত আদায় করা এবং সিজদাহর মধ্যে দুইবাহুকে বিছিয়ে দেওয়া মাকরুহ। প্রসাব বা পায়খানা আটকে রেখে, অথবা আকর্ষণ থাকার শর্তে তার সামনে খাবার উপস্থিত হলে, না খেয়ে সালাতে প্রবেশ করবে না। বরং সালাতকে পরে আদায় করবে, যদিও জামা‘আত ছুটে যায়। পাথর স্পর্শ করা, আঙ্গুল একটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করানো, বৈঠকের সময়ে দুই হাতের উপরে ভর করা, দাঁড়ি ধরা, চুল পরিপাটি করা, কাপড় গুটিয়ে রাখা মাকরূহ।

যদি হাই আসে, তবে যতটা পারে প্রতিহত করবে, যদি তা না পারে তবে সে তার হাত মুখের উপরে রাখবে। বিনা ওযরে মাটি সমান করা মাকরূহ। সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে সে ফিরিয়ে দেবে, যদিও তাকে বলপ্রয়োগ করতে হয়, হোক সে অতিক্রমকারী কোন মানুষ অথবা প্রাণী, হোক উক্ত সালাত ফরয কিংবা নফল। যদি সে তবুও যেতে চায়, তবে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি তার সাথে লড়াই করবে, যদিও এতে তাকে কিছুটা হেঁটে (সরে) যেতে হয়। মুসল্লী ও তার সুতরার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। আর সুতরা

না থাকলেও তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। সে সাপ, বিচ্ছু ও উঁকুন জাতীয় কীট হত্যা করতে পারবে। কাপড় ও পাগড়ী ঠিক করা, কোনো কিছু বহন করা ও রাখা তার জন্য জায়েয আছে। প্রয়োজনে হাত, মুখ ও চোখের মাধ্যমে ইঙ্গিত দেওয়াও জায়েয আছে। সালাতে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরূহ নয়। আর তার জন্য ইশারার মাধ্যমে উত্তর দেওয়া জায়েয আছে। যদি তার ইমামের কোন সমস্যা হয় অথবা ভুল করে, তবে সে লুকমা দেবে। যদি সালাতে কোন কিছু বাদ পড়ে যায়, তবে পুরুষেরা সুবহানাল্লাহ বলবে আর মহিলারা হাতে তালি দেবে। যদি মসজিদে থাকাকালীন তার আকস্মিকভাবে থুথু অথবা শ্লেষ্মা এসে যায়, তবে সে তার কাপড়ে থুথু ফেলবে, আর মসজিদ ছাড়া অন্যান্য স্থানে সে বাম দিকে ফেলবে। সামনে বা ডান দিকে থুথু ফেলা মাকরূহ। যদিও কোনো অতিক্রমকারী আশঙ্কা না থাকে; তবুও মুক্তাদী ছাড়া অন্যান্যদের জন্য সুতরা ছাড়া সালাত আদায় করা মাকরূহ। সুতরা হবে দেওয়াল অথবা দাঁড়ানো কোনো বস্তু, যেমন: বর্শা বা অনুরূপ অন্য কিছু যেমন উটের পিঠে বসার জন্যে ঠেস দেওয়ার লাঠি। আর সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ানো সুন্নাত; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** *বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়াবে তখন সে যেন সুতরার দিকে এবং তার কাছাকাছি সালাত আদায় করে।"* আর সুতরার কাছ থেকে সামান্য সরে যাবে; যেহেতু আল্লাহর রাসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** এমন করেছেন। আর যদি সুতরা অসম্ভব হয়, তাহলে সে একটি দাগ দিয়ে নেবে। যদি তার ওপাশ থেকে কোন কিছু পার হয়ে থাকে, তাহলে তা মাকরূহ হবে না। আর যদি সুতরা না থাকে অথবা সালাত আদায়কারী ও সুতরার মধ্য দিয়ে কোনো নারী, কুকুর অথবা গাধা অতিক্রম করে, তবে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

তার জন্য কুরআন (মাসহাফ) দেখে পড়া জায়েয আছে এবং রহমতের আয়াতে রহমত চাওয়া আর আযাবের আয়াতে আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়াও জায়েয।

ফরয সালাতে দাঁড়ানো একটি রুকন। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿... وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: 238]

“আর আল্লাহর জন্যে দাঁড়াও বিনীত হয়ে।”

তবে অক্ষম, উলঙ্গ, ভীত অথবা এলাকার ইমাম যিনি দাঁড়াতে অক্ষম তার পিছনে হলে ভিন্ন কথা। আর মুক্তাদী যদি ইমামকে রুকুতে পায়, তবু তাকবীরে তাহরীমা পরিমাণ দাঁড়াবে। তাকবীরে তাহরীমা একটি রুকন। অনুরূপভাবে ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারী মুনফারিদ উভয়ের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং রুকু করাও রুকন। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ ...﴾ [الحج: 77]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু এবং সিজদা কর।”

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলো, তারপরে নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** কাছে আসলেন ও তাকে সালাম করলেন। তিনি বললেন: *“তুমি ফিরে যেয়ে সালাত আদায় করো; যেহেতু তুমি সালাত আদায় করো নি” তিনি এরূপ তিনবার করলেন, এরপরে ঐ ব্যক্তি বলল: ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি এর থেকে আর সুন্দর করে সালাত আদায় করতে পারি না। তাই আমাকে শিক্ষা দিন। তখন নবী* **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** *তাকে বললেন: “যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর কুরআন হতে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। অতঃপর রুকু‘তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ‘ করবে। অতঃপর রুকু হতে উঠবে এবং*

ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে সাজদাহ্ করবে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে বসবে। অতঃপর তোমার পুরো সলাতে এটি করবে।” হাদীসের ইমামগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইঙ্গিত করে যে, এই হাদীসে উল্লিখিত বিষয়গুলো কোনো অবস্থাতেই রহিত হয় না। যদি তা রহিত হওয়ার সুযোগ থাকতো, তবে এই (হুকুম সম্পর্কে) অজ্ঞ বেদুইনের উপর থেকেও রহিত হয়ে যেত।

আর সালাতের এ সকল কাজ ধীর-স্থিরতা সহকারে আদায় করাও একটি রুকন, যেমনটি আগে বর্ণিত হয়েছে।

হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একটি লোককে দেখলেন যে, সে তার রুকূ এবং সিজদা কোনোটিই পূর্ণভাবে আদায় করছে না। তখন তিনি তাকে বললেন: *“তুমি সালাত আদায় করো নি। যদি তুমি এভাবেই মারা যাও, তবে তুমি এমন ফিতরাতের (পথের) উপরে থেকে মারা যাবে, যে ফিতরাতের উপরে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাখেন নি (সৃষ্টি করেননি)।”*

শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ একটি রুকন; যেহেতু ইবনু মাসউদ বলেছেন: আমাদের উপরে তাশহহুদ ফরজ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা বলতাম: *“আল্লাহর উপরে শান্তি বর্ষিত হোক, জিবরাইল ও মিকাইলের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক।”*

তখন নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বললেন: *“তোমরা এভাবে বলো না, বরং তোমরা বলবে: ‘আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহ’ (যাবতীয় মৌখিক ইবাদাত আল্লাহর জন্যই)।* এটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।

যে ওয়াজিবগুলো ভুল করে ছেড়ে দিলে সালাত আদায় হয়ে যায়, তা আটটি: তাকবীরে তাহরীমা বাদে অন্যান্য তাকবীর, একাকী সালাত আদায়কারী ও ইমামের জন্য সামি‘আল্লাহ বলা, প্রত্যেকের জন্য ‘রব্বানা লাকাল হামদ’ বলা, রুকুর ও সিজদার তাসবীহ পড়া, ‘রব্বিগফিরলী’ তথা ‘হে রব! আমাকে ক্ষমা করুন’ বলা, প্রথম তাশাহহুদ বলা ও তার জন্যে বৈঠক করা। এছাড়া যা আছে, তা হচ্ছে কাজ ও কথার সুন্নাতসমূহ।

আর সালাতে মৌখিক কথার সুন্নাতসমূহ ১৭টি: সানা পড়া, আউযুবিল্লাহ পড়া, বিসমিল্লাহ বলা, আমীন বলা, প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো, ফজরের সালাত, জুমু‘আর সালাত, ঈদের সালাত, নফল সালাতের ক্ষেত্রেও সুরা মিলানো, জোরের জায়গাতে জোরে এবং আস্তের জায়গাতে আস্তে পড়া। এরপরে ‘হে রব তোমারি সকল প্রশংসা আসমান এবং যমীন পরিপূর্ণ পরিমাণে...” এই দোয়ার শেষ পর্যন্ত পড়া। রুকু ও সিজদার তাসবীহ একবারের থেকে বৃদ্ধি করা। (দুই সিজদার মাঝখানে)

رب اغفر لي

“হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করুন” এ কথা বলা, শেষ তাশাহহুদে আউযুবিল্লাহ পড়া, এবং নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** এবং তার পরিবারের উপর শান্তি এবং বরকতের দু‘আ করা। এছাড়া অন্যান্য যা কিছু আছে, তা কর্ম জাতীয় সুন্নাত, যেমন: তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া ও রুকু হতে উঠার সময়ে হাতের আঙ্গুলগুলোকে একসাথে মিলিয়ে প্রসারিত করে কিবলার দিকে মুখ করে রাখা এবং তারপর উভয় হাতকে নামিয়ে ফেলা। এরপরে ডানহাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি চেপে ধরে, তাদেরকে নাভীর নিচে রাখা। মুসল্লির সাজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, দাঁড়ানোর সময়ে দুই পায়ের মধ্যে ফাঁকা রাখা, দাঁড়ানো অবস্থায় দুটি পায়ের মধ্যে ভর দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পরিবর্তন করা, ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে তারতীল মেনে চলা, ইমামের জন্য কিরাআতকে সংক্ষিপ্ত করা,

কিরাআত প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা লম্বা হওয়া। রুকুর মধ্যে দুই হাটুকে দুই হাতের আঙ্গুলিগুলো ফাঁক করে আঁকড়ে ধরা, রুকুতে তার পিঠকে সোজা করে পিঠ বরাবর মাথা রাখা, সিজদাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে দুই হাতের আগে দুই হাটু মাটিতে রাখা, আর দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে হাত দুটোকে হাটুদ্বয়ের আগে উঠানো, কপাল ও নাককে যমীনের উপরে ভাল করে রাখা, দুই বাহু হতে দুই পার্শ্ব, পেটকে উরুর থেকে এবং উরুকে দুই পায়ের নলা হতে আলাদা রাখা, পা দুটিকে খাড়া করে রাখা, পায়ের আঙ্গুলগুলো পৃথক রেখে ভিতরের দিক মাটির দিকে রাখা, সিজদা করার সময়ে (মাটির ওপর) দুই হাতের আঙ্গুলগুলো প্রসারিত করে এবং একটির সঙ্গে অপরটি মিলিয়ে কিবলা মুখী করে কাঁধ বরাবর রাখা আর মুসল্লীর স্বীয় হাত ও কপাল দ্বারা সাজদা করা এবং তার দুই হাত দ্বারা দুই উরুর ওপর ভর করে অন্য রাকাতের জন্য দুই পায়ের উপরে দাঁড়ানো, দুই সিজদার মাঝখানে এবং প্রথম তাশাহহুদে ইফতিরাশ করা (ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে তার উপরে বসা), দ্বিতীয় তাশাহহুদে তাওয়াররুক করা (ডান পা খাড়া রেখে বাম পা ডান পায়ের নিচ দিয়ে বের করে যমীনের উপরে বসা), দুই সিজদার মাঝখানে এবং তাশাহহুদের সময় আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে প্রসারিত করে কিবলামুখী রাখা, ডানহাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা আঙ্গুলকে বদ্ধ অবস্থায় রেখে মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুলকে গোল করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা, সালামের সময়ে ডানে বামে মুখ ফিরানো এবং ডান দিক অপেক্ষা বাম দিকে মুখ একটু বেশী ফিরানো।

ইমাম আহমাদ বলেছেন: সিজদায়ে সাহুর ব্যাপারে নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** থেকে পাঁচটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে: দুই রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে দেওয়া তারপরে সিজদা করা, তৃতীয় রাকাতে সালাম ফিরিয়ে দেওয়া তারপরে সিজদা করা, সালাতের কমতি ও বাড়তির ক্ষেত্রে এবং তাশাহুদ পড়া ব্যতিরেকে দ্বিতীয় রাকাত থেকে পরবর্তী রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া। খত্তাবী বলেন: আলেমদের কাছে সাহু সাজদার ওপর গ্রহণযোগ্য হচ্ছে এই পাঁচটি হাদিস। অর্থাৎ

ইবনু মাসউদের দু'টি হাদীস এবং আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা ও ইবন বুহাইনাহর হাদীস। সিজদায়ে সাহুকে বৈধ করা হয়েছে সালাতের মধ্যে কোনো বাড়তি বা কমতি এবং সন্দেহের কারণে, হোক তা ফরজ কিংবা নফল সালাত। তবে যদি সন্দেহের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে তা ওয়াসওয়াসার বিধান গ্রহণ করবে, যা ফেলে দিতে হয়। অনুরূপভাবে অযু, গোসল, অপবিত্রতা দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়েও। যখনই সালাত জাতীয় কোনো বিষয় যেমন: দাঁড়ানো, রুকু করা, সেজদা করা এবং বৈঠকে বসা, ইচ্ছাপূর্বক বৃদ্ধি করবে, তবে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলবশত করে, তবে তাকে সাহু সিজদা দেওয়া লাগবে; যেহেতু আল্লাহর রাসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***"যখন কোনো ব্যক্তি তার সালাতে বৃদ্ধি করবে অথবা কমতি করবে সে যেনো দুটি সিজদা করে নেয়।"*** এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

আর ভুলকারী ব্যক্তির যখনই মনে আসবে, সে তাকবীর না বলেই সালাতের তারতীবে ফিরে যাবে, যদি এক রাকাত বৃদ্ধি করে ফেলে তবে তা ছেড়ে দিয়ে তার পূর্বের অবস্থাতে ফিরে যাবে, যদি আগে তাশাহহুদ পড়ে ফেলে তবে তাশাহহুদ পুনরায় পড়বে না, তারপর সাজদা করবে ও সালাম ফিরাবে। মাসবূক ব্যক্তি (ইমামের ভুল করে) অতিরিক্ত রাকাতকে গণনা করবে না। আবার ঐ ব্যক্তিও তাতে নতুন করে শামিল হবে না, যে জানে যে সেটি অতিরিক্ত রাকাত। যদি ইমাম হয় অথবা মুনফারিদ হয়, তাকে দুইজন বিশ্বস্ত মানুষ সংবাদ দিলে তার জন্য ফিরে যাওয়া আবশ্যক, কিন্তু একজন হলে নিশ্চিত না হওয়া গেলে ফিরতে হবে না; যেহেতু আল্লাহর রাসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** যুল ইয়াদাইন নামক সাহাবীর কথায় নিশ্চিত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

এবং ছোটখাটো কাজ সালাতকে বাতিল করে না, যেমন আল্লাহর রাসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** আয়িশাহর জন্য দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং উমামাকে সালাতের মধ্যেই বহন করেছেন এবং তাকে নামিয়েও দিয়েছেন। আর

যদি সালাতের মধ্যে বৈধ এমন কোন কথা তার নির্দিষ্ট স্থান বাদে অন্যস্থানে বলে ফেলা হয়, যেমন বৈঠকের অবস্থায় কিরাত পড়া অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় তাশাহুদ পড়া, তাতে সালাত বাতিল হবে না।

তবে তার উপরে সহু সিজদা আবশ্যক হবে; রাসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** এই ব্যাপক কথার কারণে: ***"যখন তোমাদের কেউ ভুলে যাবে, সে যেন দুটি সিজদা করে নেয়।"*** আর যদি সে সালাত পূর্ণ করার আগে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুল করে সালাম ফিরিয়ে ফেলে আর তারপরে যদি কাছাকাছি সময়ে তার স্মরণে আসে, তবে সে বাকীটুকু আদায় করে নিবে। যদিও সে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় এবং সালাত সংক্রান্ত সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে ফেলে, আর যদি সে ভুল করে এমন কথা বলে অথবা ঘুমিয়ে পড়ে তার প্রভাবে এমন কথা বলে, অথবা কিরাতের সময়ে তার জিহ্বাতে এমন কোন কথা চলে আসে, যা কুরআনে বর্ণিত হয়নি, তাতে সালাত বাতিল হবে না। আর যদি সে অট্টহাসি দিয়ে ফেলে, তবে মুসলিম উম্মাহর ইজমাতে (ঐক্যমতে) সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি সে মুচকি হাসি দেয়, তবে বাতিল হবে না। আর যদি তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোনো রুকন ভুলে যায় এবং তার একথা মনে আসে পরবর্তী রাকাতের কিরাতের মাঝখানে, তবে তারও আগের রাকাতটি বাতিল হয়ে যাবে, আর দ্বিতীয় রাকাত তার স্থানান্তরিত হবে। এবং সে সানাকে পুনরাবৃত্তি করবে না, এটা ইমাম আহমদ বলেছেন। আর যদি কিরাত শুরু করার আগে তার স্মরণ হয়ে থাকে, তবে সে রুকন ও তার পরবর্তীতে যা রয়েছে সেগুলো পুনরায় করবে। আর যদি সে প্রথম তাশাহুদ ভুলে যায় এবং উঠে পড়ে তার জন্য ফিরে আসা আবশ্যক, যতক্ষণ না সে সোজাসোজিভাবে দাঁড়িয়ে যায়; যেহেতু মুগীরার হাদীসে এটি এসেছে, যা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন: মুকতাদীর উপরে আবশ্যক যে, সে ইমামের অনুসরণ করবে, তার উপর হতে তাশাহহুদ রহিত হয়ে যাবে। ভুলের

জন্য সিজদায়ে সাহু করবে। আর যে ব্যক্তির সালাতের রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেবে, সে ইয়াকিনের (কম সংখ্যাটির) উপরে নির্ভর করবে। আর মুকতাদী তার সালাতে সন্দেহ হলে, সে ইমামের অনুসরণ করবে। যদি সে ইমামকে রুকু করা অবস্থায় পায় এবং তার সন্দেহ হয় যে, সে ইমামকে রুকু করা অবস্থাতে পাওয়ার আগেই ইমাম মাথা উত্তোলন করেছে কিনা, তাহলে সে উক্ত রাকাত গণনা করবে না। আর যখন সে ইয়াকিনের ভিত্তিতে (কম সংখ্যার উপরে ভিত্তি করে) শুরু করবে, তখন তার বাকী সালাত পূর্ণ করবে, আর উক্ত রাকাত তার ইমামের সালাম ফিরানোর পরে আদায় করবে এবং সিজদায়ে সাহু করবে।

মুকতাদীর জন্য তার ইমামের ভুল না হলে সিজদায়ে সাহু দেওয়া আবশ্যক হবে না, (ইমামের ভুল হলে) মুকতাদী তার সাথে সিজদায়ে সাহু করবে, যদিও তার তাশাহহুদ পড়া শেষ না হয়, তবে সিজদার পরে সে পূর্ণ করে নেবে। মাসবূক ব্যক্তি তার ইমামের সঙ্গে ভুলে সালাম ফিরানোর কারণে এবং ইমামের সাথে তার ভুলের কারণে এবং যেই ভুল সে একাকি করেছে তার জন্যে সিজদায়ে সাহু করবে। আর তার স্থান হলো হচ্ছে সালামের আগে। তবে যদি সে এক রাকাত অথবা তার বেশী রাকাত কম হওয়ার কারণে সালাম ফিরিয়ে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। যেহেতু ইমরান ও যুল ইয়াদাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের হাদীসে এভাবে এসেছে। এছাড়া যদি সে প্রবল ধারণা অনুযায়ী প্রাপ্ত রাকাত সংখ্যার উপরে আমল করে থাকে, আমরা যদি এই মতটি গ্রহণ করে থাকি, তবে সালামের পরে সিজদায়ে সাহু করা মুস্তাহাব; যেহেতু এটি আলী এবং ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে এসেছে: আর যদি সালামের আগে অথবা পরে সে ভুলে যায়, তবে খুব বেশী সময় পার না হলে সে তা আদায় করে নেবে। সিজদায়ে সাহুতে এবং সিজদায়ে সাহু থেকে ওঠার পরে যা বলতে হবে তা সালাতের সিজদার মতই।

অধ্যায়: নফল সালাত

আবুল আব্বাস বলেন: নফল সালাতের মাধ্যমে কিয়ামতের দিন ফরয সালাতকে পূর্ণ করা হবে, যদি ফরয সালাতকে পূর্ণ না করে থাকে। এ ব্যাপারে একটি মারফু হাদীস রয়েছে। অনুরূপভাবে যাকাত ও অন্যান্য আমলসমূহ। সর্বোত্তম নফল হচ্ছে জিহাদ, এরপরে এর অনুগামী বিষয়সমূহ যেমন, জিহাদের ব্যাপারে অর্থ যোগান দেওয়া এবং অন্যান্য। এরপরে ইলম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া।

আবূ দারদা বলেন: ***ইলম শিক্ষাকারী ও শিক্ষক সওয়াবের দিক থেকে সমান।***

আর বাকী সকলেই সাধারণ বা বোকা শ্রেণির মানুষ, তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। ইমাম আহমাদ হতে বর্ণিত: যার নিয়ত সহীহ, তার ইলম শিক্ষা করাই সবচেয়ে উত্তম আমল। তিনি আরো বলেন: রাতের কিছু অংশ ইলমের আলোচনা করা আমার কাছে পুরো রাত জেগে থাকা থেকে উত্তম। তিনি আরো বলেছেন: প্রতিটি ব্যক্তির উপরে এতটুকু পরিমাণ ইলম অর্জন করা অত্যাবশ্যক, যতটুকু হলে তার দীন পালন সঠিকভাবে চলতে পারে। তাকে বলা হল: উদাহরণ স্বরূপ কোন কোন বিষয়? তিনি বললেন: যতটুকু না জানা থাকলেই নয়, যেমন: সালাত, সিয়াম ও অনুরূপ অন্যান্য। আর তারপরে অত্যবশ্যক হচ্ছে সালাত, যেহেতু একটি হাদীসে রয়েছে: ***“তোমরা (দীনের উপরে) দৃঢ় থাকো, আর তোমরা তা কখনোই পূর্ণ করতে পারবে না (তাই সাধ্য মোতাবেক করবে), এবং জেনে রেখ! তোমাদের সর্বোত্তম আমল হচ্ছে সালাত।”***

তারপরে সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে: যার উপকারিতা অপর পর্যন্ত অতিক্রমকারী, যেমন: রোগীকে দেখতে যাওয়া অথবা কোনো মুসলিমের প্রয়োজন মিটানো

অথবা মানুষের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করা; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***“আমি কি তোমাদেরকে সালাত ও সিয়াম থেকেও উত্তম তোমাদের এমন সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে সংবাদ দেব না? (তা হল:) মানুষের মধ্যকার বিবাদের মীমাংসা করে দেওয়া; কেননা পরষ্পরের বিবাদ হচ্ছে বিনাশকারী।”*** তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন।

ইমাম আহমাদ বলেছেন: জানাযাতে অংশগ্রহণ সালাত হতেও উত্তম, এবং যার উপকারিতা অতিক্রম করে তার সওয়াবের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন দারিদ্র নিকটাত্মীয়কে দান করা গোলাম আযাদ করা হতে উত্তম। আর গোলাম আযাদ করা অপরিচিত কাউকে দান করা অপেক্ষা উত্তম, তবে দূর্ভিক্ষের সময় হলে আলাদা কথা। তারপরে হজ্জ করা। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে মারফূ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে: ***“যে ব্যক্তি ইলম শেখার উদ্দেশ্যে বের হলো, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে।”*** তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান গরীব। শাইখ বলেছেন: ইলম শিক্ষা করা এবং শিখানো জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এটি জিহাদেরই একটি প্রকার। তিনি আরো বলেছেন: যে জিহাদে জান-মাল নিরাপত্তার সাথে বাকী থাকে এমন জিহাদ হতে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনে সাধ্য অনুযায়ী রাত-দিনে ভালভাবে ইবাদাত করা বেশী উত্তম। আহমাদ হতে আরো বর্ণিত আছে যে, হজ্জের সামঞ্জস্যশীল কোনো কাজ নেই, যেহেতু এতে অনেক বেশী ক্লেশ রয়েছে, অনেক নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তাতে এমন একটি সময় রয়েছে যার অনুরূপ ইসলামে আর নেই। তা হচ্ছে আরাফার সন্ধ্যা, আর এতে আর্থিক ও শারিরীক দুই ধরণেরই কষ্ট হয়। আবূ উমামাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: এক ব্যক্তি নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে** জিজ্ঞাসা করলেন: ***কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেন: “তোমার উপরে আবশ্যক হচ্ছে সিয়াম পালন করা; কেননা এর মত কোনো আমলই নেই।”*** আহমাদ ও অন্যন্যরা হাদীছটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ বলেছেন: নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** ও তার খলীফাগণের কর্ম আলোকে অবস্থা ও প্রয়োজনের ভিন্নতার কারণে উক্ত কাজগুলোর প্রত্যেকটিই একেকটি অবস্থাতে সর্বোত্তম কাজ হতে পারে। আহমাদের বক্তব্যও এ রকম: তুমি ভেবে দেখ, তোমার কলবের জন্য যা সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য, তুমি সেটিই করবে। ইমাম আহমাদ চিন্তা-ভাবনাকে সালাত ও সাদাকার উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। এখান থেকে একটি দিক বের হয়, তা হচ্ছে: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল অপেক্ষা অন্তরের আমলের ফযীলত বেশী। আর সাহাবাদের উদ্দেশ্যও ছিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল, এ মতকে নিম্নোক্ত হাদীস শক্তিশালী করে: ***"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে: আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসা, আর আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করা।"*** এবং এই হাদীস- ***"ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ়তম বন্ধন হচ্ছে: (আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসা, আর আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করা)।"***

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নফল হলো: সূর্য গ্রহণের সালাত, তারপরে বিতর, তারপরে ফযরের সুন্নাত, তারপরে মাগরিবের সুন্নাত, তারপরে অন্যান্য নফল সালাতসমূহ। বিতরের সালাতের ওয়াক্ত ইশার পর থেকে নিয়ে ফযর উদিত হওয়া পর্যন্ত। আর তার সর্বোত্তম ওয়াক্ত হচ্ছে শেষ রাত্রে, এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে, ওঠার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবে। অন্যথায় সে শোয়ার আগে বিতর পড়ে নেবে। বিতরের সর্বনিম্ন রাকাত সংখ্যা এক রাকাত আর সর্বোচ্চ ১১ রাকাত। সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে- দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেওয়া, এরপরে এক রাকাতকে আলাদাভাবে পড়া। আর যদি নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত অন্য কোনো পন্থায় এটিকে পড়া হয় তবে তাও ভাল। আর পূর্ণতার সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে তিন রাকাত এবং সর্বোত্তম হচ্ছে তা দুই সালামে আদায় করা এবং এক সালামে আদায় করা জায়িজ রয়েছে। এবং মাগরিবের মত করেও আদায় করা যাবে।

আর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হচ্ছে দশটি: সেগুলোকে বাড়িতে পড়া উত্তম। সেগুলো হচ্ছে: যোহরের আগের দুই রাকাত এবং যোহরের পরের দুই রাকাত মাগরিবের পরের দুই রাকাত, ইশার পরের দুই রাকাত এবং ফজরের দুই রাকাত।

ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাতকে সংক্ষিপ্ত করবে, এবং তার দুই রাকাতে দুই ইখলাস সূরা (ইখলাস ও কাফিরূন) পড়বে। অথবা প্রথমটিতে পড়বে, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا... ﴾[البقرة: 136]

"তোমরা বলো আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।" এই আয়াতটি, যা সূরা বাকারায় রয়েছে।

আর দ্বিতীয় রাকাতে সে পড়বে:

﴿ قُلۡ يَـٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۭ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا ﴾[آل عمران: 64]

"তুমি বলো, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা এমন একটি কথার দিকে আসো, যা তোমাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে একই।" এই আয়াত। এবং এই নফলগুলো বাহনে থাকা অবস্থায়ও আদায় করা যায়।

জুমুআর আগে কোন সুন্নাত নেই, তবে জুমুআর পরে দুই রাকাত অথবা চার রাকাত সুন্নাত রয়েছে। আর জুমু'আর আগে তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত যথেষ্ট হবে। আর মুসল্লির জন্য ফরয এবং সুন্নাতের মাঝে বিচ্ছেদ করা উচিত, কথার মাধ্যমে অথবা কিছু সময় দাঁড়ানোর মাধ্যমে; যেহেতু এ ব্যাপারে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে হাদীস রয়েছে। আর যার কাছ থেকে কোন সুন্নাত ছুটে

যাবে, তার জন্য কাযা আদায় করা মুস্তাহাব। আর আযান এবং ইকামাতের মধ্যে নফল আদায় করা মুস্তাহাব।

তারাবীহ হচ্ছে সুন্নাত, যা আল্লাহর রাসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** সুন্নত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তা জামা'আতের সাথে আদায় করা উত্তম। আর ইমাম কিরাআত জোরে পড়বেন; যেহেতু পূর্ববর্তীদের থেকে পরবর্তীরা এ বিষয়টি নকল করেছেন। আর প্রত্যেক দুই রাকাতের মধ্যে সালাম ফিরাবে; যেহেতু হাদীসে এসেছে: ***"রাতের সালাত দুই রাকা'আত দুই রাকা'আত করে।"*** তারাবীহর ওয়াক্ত শুরু হয় ইশার ফরয ও সুন্নাত আদায়ের পরে বিতরের সালাতের আগে ফযর উদিত হওয়া পর্যন্ত, এবং তারাবীহ সালাতের পরে বিতর আদায় করতে হয়। যদি মুসল্লী তাহাজ্জুদ পড়তে চায়, তবে বিতর সালাত তাহাজ্জুদের পরে পড়বে; যেহেতু আল্লাহর রাসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***"বিতরকে তোমাদের রাতের সর্বশেষ সালাত বানাও।"*** আর যে তাহাজ্জুদ পড়বে তার জন্যও ইমামের অনুগামী হওয়া ভাল, যখন ইমাম সালাম ফিরাবে, তখন সে এক রাকাত বিতর পড়ে নেবে; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***"যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কিয়াম করবে, যতক্ষণ না ইমাম চলে যায়। তার জন্য এক রাতের কিয়ামকে লিপিবদ্ধ করা হবে।"*** ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। কুরআন হিফয করা সকলের ঐক্যমতে মুস্তাহাব। কুরআন তেলাওয়াত সমস্ত যিকির থেকে উত্তম। আর যে অংশটুকু সালাতের জন্য ওয়াজিব, তা মুখস্ত (হিফয) করাও ওয়াজিব। কঠিন না হলে বাচ্চার অভিভাবক অন্যান্য ইলমের আগেই কুরআন দিয়ে শুরু করবে। প্রতি সপ্তাহে একবার খতম করা সুন্নাত এবং কখনো কখনো এর থেকে কম সময়েও করা যাবে। তবে ভুলে যাওয়ার ভয় থাকলে তেলাওয়াত দেরীতে করা হারাম।

কিরাআতের শুরুতে ‘আঊযুবিল্লাহ’ পড়বে, ইখলাসের প্রতি আগ্রহী হবে আর এর বিপরীত কিছু মনে আসলে প্রতিহত করবে। শীতের মৌসুমে রাতের প্রথম অংশে খতম করবে আর গরমের মৌসুমে দিনের প্রথম অংশে খতম করবে। তালহা ইবনু মুসাররিফ বলেছেন: আমি এই উম্মাতের কল্যাণওয়ালাদের পেয়েছি, যারা উক্ত বিষয়টি পছন্দ করতেন: যদি দিনের প্রথমভাগে কুরআন খতম করা হয়, তবে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দু‘আ করতে থাকে। আর রাতের প্রথমভাগে যদি খতম করা হয়, তবে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দু‘আ করতে থাকে। সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস সূত্রে দারিমী এটি বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ হাসান। কুরআন সুন্দর আওয়াজে তেলাওয়াত করবে এবং তারতীল সহকারে (ধীরে ধীরে) পাঠ করবে। গভীর চিন্তা ও গবেষণার সাথে পড়বে। রহমাতের আয়াত তেলাওয়াতের সময়ে আল্লাহর কাছে রহমত চাইবে আর আযাবের আয়াত তেলাওয়াতের সময়ে তা থেকে পানাহ চাইবে।

সালাতরত, ঘুমন্ত ও অন্য তেলাওয়াতকারীদের মধ্যে এমন জোরে পড়বে না, যা তাদেরকে কষ্ট দেয়। দাঁড়ানো, বসা, শোয়া, আরোহী ও পায়ে হেটে চলা অবস্থায় কুরআন পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। রাস্তায় কোরআন তেলাওয়াত করা মাকরুহ নয় এবং ছোট নাপাকী অবস্থায় থাকলেও তা মাকরুহ হবে না, তবে নোংরা স্থানে তেলাওয়াত করলে তা মাকরুহ হবে। কোরআনের জন্য জমায়েত হওয়া এবং ক্বারীর তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শোনা মুস্তাহাব এবং ঐ সময়ে যে কথার কোন উপকারিতা নেই, এমন কিছু আলোচনা করা যাবে না। ইমাম আহমাদ কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে দ্রুত তেলাওয়াত করাকে অপছন্দ করেছেন। তিনি আরোও অপছন্দ করেছেন লাহান (সুর) সহকারে তেলাওয়াত করা, আর লাহান হচ্ছে: যা গানের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে। কুরআনের একটি আয়াতকে বারবার তেলাওয়াত করা মাকরুহ নয়। আর যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে তার বিবেক প্রসূত এবং না জেনে কোনো ব্যাখ্যা দিল, সে যেন তার

ঠিকানা জাহান্নামের মধ্যে নির্দিষ্ট করে নিল। যদি সে সঠিক বলে তবুও সে ভুল করেছে। অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়, তবে সে কোন কিছুর মাধ্যমে তা বহন করতে পারবে অথবা অন্য মালপত্র রয়েছে এমন কিছুর উপরে নিতে পারবে এবং তার আস্তিনের ভেতরও রাখতে পারবে। সে কাঠ বা অনুরূপ অন্য কিছুর মাধ্যমে তা খুলতে (পৃষ্ঠা উল্টাতে) পারবে, তার জন্য তাফসীর এবং এমন বইসমূহ যার মধ্যে কুরআন রয়েছে তা স্পর্শ করা জায়িজ রয়েছে। নাপাক ব্যক্তির জন্য স্পর্শ না করে তা লেখা বৈধ এবং কুরআনের নুসখা বা অনুলিপি তৈরি করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। কুরআনের উপরে রেশমের কাপড় লাগানো যাবে। এটিকে পিছনে নেওয়া এবং তার দিকে পা প্রসারিত করা বা অনুরূপ অন্য কোনো কাজ করা, যার দ্বারা কুরআনের সম্মান নষ্ট করা হয়, তা বৈধ হবে না। কুরআনকে সোনা বা রোপা দিয়ে অলংকৃত করা মাকরুহ। তাতে দশমাংশ, সূরার নাম, আয়াতের সংখ্যা লেখা এবং অন্যান্য বিষয় লেখাও মাকরুহ, যা সাহাবাদের যামানায় ছিল না।

কুরআন অথবা যার মধ্যে আল্লাহর যিকির রয়েছে, এমন কোনো বস্তুকে অপবিত্র কোন জিনিস দ্বারা লেখা হারাম। যদি কেউ তা দ্বারা লিখে ফেলে অথবা তার (অপবিত্র বস্তুর) উপরে লিখে ফেলে, তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব হবে। আর কুরআন যদি পুরাতন-জীর্ণ হয়ে যায় অথবা ছিঁড়ে যায়, তবে দাফন করতে হবে। কেননা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা ‘আনহু মাসহাফসমূহকে কবর এবং মিম্বারের মাঝখানে দাফন করে দিয়েছিলেন।

সাধারণ নফল সালাত শুধু নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ ছাড়া অন্য সকল সময়ে পড়া মুস্তাহাব। আর রাতের সালাত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, আর তা দিনের নফল সালাতের থেকে উত্তম। আর রাতে ঘুম থেকে ওঠার পরে রাতের সালাত আদায় করা উত্তম; কেননা ঘুম থেকে উঠা ছাড়া

‘ناشئة’

বা ‘উদ্যমতা’ শব্দটি প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং যদি কেউ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তাহলে আল্লাহর যিকির করবে। এ ব্যাপারে যা কিছু হাদীসে এসেছে তা বলবে, যার মধ্যে অন্যতম হলো:

“ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله”

অর্থ: “আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর জন্যই প্রশংসা, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আর আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নাই। আর আল্লাহই সবচেয়ে বড় এবং আল্লাহর পক্ষ হতে ছাড়া কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।” তারপরে সে বলবে:

اللهم اغفر لي

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন।” অথবা অন্য যে কোনো দু‘আ করবে, তা কবুল করা হবে। সুতরাং সে যদি অযু করে এবং সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত কবুল হবে। তারপর সে বলবে:

“الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك”

অর্থ: “আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনিই আল্লাহ, যিনি আমাকে আমার মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তার কাছেই পুনরুত্থান। (হে আল্লাহ) আপনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, আপনি এক, আপনার কোনো শরীক নেই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি আপনার কাছে আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি আর আপনার রহমত প্রার্থনা করছি।”

اللهم زدني علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
الحمد لله الذي ردّ علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার ইলমকে বাড়িয়ে দিন এবং আমাকে আপনি হেদায়েত দান করার পরে আমার অন্তরকে বাঁকা করে দিয়েন না। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি সুমহান দাতা। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি আমার রূহকে পুনরায় ফেরত দিয়েছেন এবং আমার দেহ থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে তার স্মরণ করার অনুমতি দিয়েছেন।" এরপর সে মিসওয়াক করবে তারপরে যখন সে সালাতের জন্য দাঁড়াবে, যদি সে চায় এমন সানা পড়বে যা ফরয সালাতে পড়া হয়, আর যদি সে চায় অন্য কিছুও পড়তে পারবে যেমন:

"اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدِّم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك"

"হে আল্লাহ! আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান-যমীন ও তাদের মধ্যে বিদ্যমান যা কিছু আছে, সবকিছুর নূর। আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান, যমীন ও তাদের মাঝে বিদ্যমান সবকিছুর মহা-তত্বাবধায়ক। আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান, যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক। আপনার জন্য সকল প্রশংসা, আপনি সত্য; আপনার ওয়াদা সত্য; আপনার বাণী সত্য; আপনার সাক্ষাৎ সত্য; জান্নাত সত্য; জাহান্নাম সত্য; নবীগণ সত্য, কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম; আপনার প্রতি ঈমান আনলাম; আপনার উপরেই তাওয়াক্কুল করলাম, আপনার সাহায্যেই তর্কে লিপ্ত হলাম এবং আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম।

অতএব আমি যা অগ্রে প্রেরণ করেছি ও যা পেছনে ছেড়ে এসেছি, যা প্রকাশ করেছি ও যা গোপন করেছি, যা আপনি আমার চেয়েও ভাল জানেন, তা সব ক্ষমা করে দিন। আপনি আদি এবং আপনিই অন্ত। আপনি ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই, আর আপনার পক্ষ হতে ছাড়া কোনো শক্তিও নেই।” যদি সে ইচ্ছা করে, তবে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করতে পারবে:

" اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم“

“হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, গায়েব ও প্রকাশ্য সবকিছু জান্তা, আপনার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত আপনিই তার মীমাংসা করে দিবেন। যেসব বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তন্মধ্যে আপনি আপনার অনুমতিক্রমে আমাকে যা সত্য সেদিকে পরিচালিত করুন। নিশ্চয় আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।”

তাহাজ্জুদকে সংক্ষিপ্ত দুই রাকাতের মাধ্যমে শুরু করা সুন্নাত। আর তার জন্যে কিছু নফল থাকা জরুরি যার ওপর সে নিয়মিত করবে, যদি তা ছুটে যায়, তবে তা কাযা আদায় করবে।

সকাল ও সন্ধ্যায় যা কিছু (কুরআন-সুন্নাহতে) দু‘আ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, তা পাঠ করা মুস্তাহাব। অনুরুপভাবে ঘুমের সময়ে, জাগ্রত হওয়ার সময়ে, বাড়িতে প্রবেশের সময়ে এবং বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ইত্যাদিতে (দু‘আ পাঠ করা মুস্তাহাব)। আর যে নফল সালাত জামা‘আতে আদায় করার অনুমোদন নেই, তা বাড়িতে পড়াই উত্তম, এবং তার কিরাআতও আস্তে আওয়াজে পড়া উত্তম। নফল সালাত অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ না করার শর্তে জামা‘আতে আদায় করা জায়িয আছে। ভোর বেলাতে ইস্তিগফার বেশী বেশী করা মুস্তাহাব। যার তাহাজ্জুদ কাযা

হয়ে যাবে, সে যোহরের আগে তা আদায় করে নেবে। হেলান দিয়ে শোয়া ব্যক্তির নফল আদায় করা বিশুদ্ধ হবে না।

সালাতুদ দুহা তথা চাশতের সালাত আদায় করা সুন্নাত। এর ওয়াক্ত হচ্ছে যখন (ফযরের পরের) নিষিদ্ধ ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তখন হতে দ্বি-প্রহরের আগ পর্যন্ত। যখন তাপমাত্রা বেশী হয়, তখন এটি আদায় করা উত্তম। এটি দুই রাকাত, তবে বেশী পড়লে আরো ভাল।

ইস্তিখারার সালাত সুন্নাত। যখন কোনো বিষয়ের চিন্তা করবে, তখন ফরয সালাতের অতিরিক্ত দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করে বলবে:

"اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه بعينه - خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري) عاجله وآجله (فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به "

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে আপনার কল্যাণ কামনা করছি, আপনার কুদরতের মাধ্যমে শক্তি কামনা করছি, আর আপনার মহা অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা আপনিই সর্বশক্তিমান, আর আমি শক্তিমান নই, আপনিই জানেন আর আমি জানি না এবং আপনিই গায়েবের জ্ঞান রাখেন। হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, এই কাজটি – এখানে নির্দিষ্ট কাজের নাম বলবে- আমার দীন ও দুনিয়ায়, ইহকালে ও পরকালে দ্রুত বা বিলম্বে আমার পক্ষে কল্যাণকর হবে, তাহলে আমার জন্য তা নির্ধারিত করে দিন। এবং তা প্রাপ্তি আমার জন্য সহজ করে দিন। অতঃপর তাতে বরকত দিন। হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, এই কাজটি আমার দীন ও দুনিয়ায়, ইহকালে ও পরকালে অকল্যাণকর হবে, তাহলে তাকে আমার থেকে দূর করে দিন আর আমাকেও তার

থেকে দূর করে দিন, আর আমার জন্য কল্যাণকেই নির্দিষ্ট করে দিন যেখানেই তা থাকুক। তারপর আপনি আমাকে ঐ ব্যাপারে খুশি করে দিবেন।” তারপরে যে কাজটি করবে তার প্রতি ইশারা করবে; তবে ইস্তিখারার সময়ে উক্ত কাজটি করা বা না করার ক্ষেত্রে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে না।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ, অযুর পরে দু'রাক'আত সালাত এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে অতিরিক্ত সালাত আদায় করা সুন্নাত। তিলাওয়াতের সিজদা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়; কেননা উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন: যে (এই) সিজদা করবে, সে ভাল করল আর যে না করল, তার কোনো গুনাহ হবে না। এটি ইমাম মালিক তাঁর মুআত্তায় বর্ণনা করেছেন। তিলাওয়াত শ্রবনকারীর জন্যও তিলাওয়াতের সিজদা করা সুন্নাত। আরোহণকারী ব্যক্তি তিলাওয়াতের সিজদা ইশারাতে আদায় করবে, মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন। পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তি যমিনে কিবলামুখী হয়ে তিলাওয়াতের সিজদা করবে। তবে অনিচ্ছাপূর্বক তিলাওয়াত শ্রবণকারীর জন্য তিলাওয়াতে সিজদা করা আবশ্যক নয়; যেহেতু এটি সাহাবাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একজন অল্প বয়সী কারীকে বলেছিলেন: “তুমি সিজদা কর; যেহেতু তুমি আমাদের ইমাম।”

নতুন কোনো প্রকাশ্য নি'আমাত, হোক তা ব্যাপক অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট, তার জন্য সিজদায়ে শোকর আদায় করা মুস্তাহাব। যখন সে এমন কোন ব্যক্তিকে দেখবে, যে ঋণ অথবা শারীরিক সমস্যাতে জর্জরিত, তখন সে বলবে:

“الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ”

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি তোমাকে য দ্বারা পরীক্ষা করেছেন, তা হতে আমাকে রক্ষা করেছেন, আর আমাকে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তাদের অধিকাংশের উপরে একটি সম্মানজনক মর্যাদা দান করেছেন।”

সালাতের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত পাঁচটি: ফযরের সালাতের পরে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত, সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে এক বর্শা পরিমাণ উপরে ওঠা পর্যন্ত, সূর্য একদম মাথার উপরে আসার পর থেকে একদিকে ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত, আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত নিকটবর্তী হওয়া, ও সূর্যাস্ত নিকটবর্তী হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে এ সময়ে ফরয সালাতের কাযা আদায়, মানতের সালাত, তাওয়াফের দুই রাকাত, ব্যক্তির মসজিদে থাকাবস্থায় পুনরায় মসজিদের জামা'আতে শরীক হওয়া ইত্যাদি করা যাবে। আর অবশ্যই এই দুটি লম্বা সময়ে জানাজার সালাতও আদায় করা যাবে।

অধ্যায়: জামা'আতে সালাত আদায়

জুমু'আ ও ঈদের সালাত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে জামা'আতের জন্য সর্বনিম্ন মুসল্লীর সংখ্যা দুইজন। জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা ফরযে আইন, তা মুসাফির ও মুকিম এমনকি খাওফের (ভয়ের) ক্ষেত্রেও; কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ... ﴾[النساء: 102]

"যখন তুমি তাদের সাথে (যুদ্ধের ময়দানে) অবস্থান করবে তখন সালাতের সময় হলে তাদেরকে নিয়ে সালাত কায়েম কর।" আয়াত। একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় সাতাশ গুণ বেশী ফযীলতপূর্ণ, জামা'আত মাসজিদে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর বায়তুল্লাহ সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ, এমনিভাবে যেই জামা'আতে লোক সংখ্যা যত বেশী হয় এবং যেই জামা'আত যত বেশী দূরে প্রতিষ্ঠিত হয় তা তত বেশী ফযীলতপূর্ণ। কোন মসজিদে নিয়োজিত ইমামের জামা'আতের পূর্বে কোনো সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা যাবে না, তবে

তার অনুমতিক্রমে এটা করা যেতে পারে, তবে দেরী হওয়ার কারণে এমনটা করলেও তা মাকরূহ হবে না; যেহেতু এটা আবূ বকর ও আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম এমনটি করেছেন। যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হবে তখন কোন নফল শুরু করা জায়েয হবে না। আর যদি নফল সালাত চলাকালে সালাতের ইকামত দেওয়া শুরু হয়, তাহলে নফল আদায়কারীকে উক্ত নফল সালাত অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ করতে হবে। যে ইমামের সাথে কোন সালাতের এক রাকাত পাবে, সে জামা‘আত পেয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। আর ইমামের সাথে রুকূ করতে পারলে রাকাত পেয়েছে বলে বিবেচিত হবে। আর তাকবীরে তাহরীমা রুকুর তাকবীরের জন্য যথেষ্ট হবে (অতিরিক্ত করে রুকুর তাকবীর দেওয়া লাগবে না); যেহেতু এটা যায়েদ ইবন ছাবিত ও ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, আর সাহাবাগণের মধ্যে কেউ এই বিষয়ে তাদের সঙ্গে দ্বিমত করেছেন বলেও জানা যায়নি। তবে যারা রুকুর তাকবীরকে ওয়াজিব বলেছেন তাদের মতানৈক্য থেকে মুক্ত থাকার স্বার্থে উভয় তাকবীর পৃথকরূপে দেওয়াটাই অধিক উত্তম, সুতরাং যদি মুসল্লী ইমামকে রুকুর পরে পায়, তাহলে সে উক্ত রাকাতটি পায়নি বলে বিবেচিত হবে। আর তার জন্য (এই অবস্থায়) ইমামের অনুসরণ করা জরুরী, তার জন্য ইমামের সাথে সালাতে প্রবেশ করা সুন্নাহ, যা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। মাসবূক ব্যক্তি ইমামের দ্বিতীয় সালামের পূর্বে দাঁড়াবে না, যদি সে (মাসবূক) ইমামকে সালামের পরে সাহূ সাজদায় পায়, তাহলে এই অবস্থায় সে ইমামের সাথে সালাতে প্রবেশ করবে না।

আর যদি তার জামা‘আত ছুটে যায়, তাহলে তার সাথে (অন্য কারো) সালাতে শামিল হওয়া মুস্তাহাব। কারণ নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম** বলেছেন: ***“যে এই ব্যক্তিকে (নেকী) সদকা করতে চায়, সে যেনো এই ব্যক্তির সাথে সালাতে শামিল হয়ে যায়।”*** মুকতাদীর জন্য ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব নয়; যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف:204]

"আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুন এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।" আহমাদ বলেছেন: এই আয়াতটি সালাতের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে, এ ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা রয়েছে।

যেই সালাতে ইমাম উঁচু স্বরে কিরাত পাঠ করে না সেই সালাতে কিরাত পাঠ করা মুকতাদীর জন্য সুন্নাহ। সাহাবী ও তাবেঈনদের মধ্যে অধিকাংশ আলেম নিরবে কিরাত পাঠ করা হয় এমন সালাতে ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করার পক্ষে মত পোষণ করতেন। এমনটি করা হবে যারা এটাকে ওয়াজিব বলেছেন তাদের মতানৈক্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা কিরাআত পাঠ পরিত্যাগ করব এমন সালাতে, যেই সালাতে ইমাম উঁচু স্বরে কিরাত পাঠ করে; কারণ এই মতের পক্ষে অনেক দলীল আছে। আর মুসল্লী সালাতের কর্মগুলো ইমাম শেষ করার পর পরই শুরু করবে কোন ধরণের বিলম্ব ছাড়া, তবে ইমামের সাথে সাথে সেগুলো পালন করলে মাকরূহ হবে। আর সালাতের কোনো কর্ম ইমামের আগে শুরু করলে তা হারাম হবে, সুতরাং সে যদি ভুলবশত ইমামের পূর্বে কোনো রুকু অথবা সিজদা করে, তাহলে তাকে সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে; যাতে করে সে ইমামের পরে তা আদায় করতে পারে, যদি সে এটা জেনে বুঝেও ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের পূর্বে শুরু করা কাজটি থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কারণ ছাড়াই কোনো রুকনে সে ইমাম থেকে বিলম্ব করে ফেলে, তাহলে এই ক্ষেত্রেও ইমামের পূর্বে কোনো রুকন আদায় করার বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি ঘুম আসা, অথবা অসতর্কতা, অথবা ইমামের তাড়াহুড়া করা এই জাতীয় কোনো কারণে এমনটি হয়ে থাকে, তাহলে সে উক্ত রুকনটি আদায় করে ইমামের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কোনো

কারণবশত সালাতে থাকা অবস্থায় এক রাকাত ছুটে যায় অর্থাৎ ইমামের এক রাকাত পিছনে পড়ে যায়, তাহলে সে ইমামকে অবশিষ্ট সালাতে অনুকরণ করবে আর ইমাম সালাম ফিরালে সে উক্ত রাকাতটি কাযা করে নিবে। আর যদি সালাত থেকে বের হওয়ার দাবি রাখে এমন কোনো প্রয়োজন কোনো মুকতাদীর ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, তাহলে ইমামের জন্য সালাত একটু দ্রুত সম্পন্ন করা সুন্নাত, তবে এতটা দ্রুত সালাত সম্পন্ন করা মাকরূহ হবে, যা কোনো মুকতাদীর জন্য সালাতের সুন্নাত আদায়ের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম রাকাতের কিরাআত দ্বিতীয় রাকাতের কিরাআতের তুলনায় অধিক দীর্ঘায়িত করা সুন্নাত। আর ইমামের জন্য সালাতে প্রবেশকারীর জন্য অপেক্ষা করা মুস্তাহাব, যদি অন্যান্য মুকতাদীর কোনো কষ্ট না হয়।

ইমাম হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে ভালোভাবে পড়তে পারেন। আর উবাই ও মু‘আযের এর ন্যায় কারী থাকা সত্ত্বেও নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** কর্তৃক আবূ বকরকে ইমামতির জন্য সামনে অগ্রসর করে দেওয়ার কারণ কী? এই বিষয়ে আহমাদ উত্তর দিয়েছেন যে, এটা করার উদ্দেশ্য হল যাতে তারা বুঝতে পারেন যে, তিনি বড় ইমামতির ক্ষেত্রে (খিলাফতের নেতৃত্ব) অগ্রাধিকার পাবেন। আর অন্যরা বলেছেন: ***“কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে এমন ব্যক্তি যে তাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব সর্বাধিক শ্রেষ্ঠরূপে পড়তে জানে, আর যদি তারা এই ক্ষেত্রে সমান হয়, তাহলে সুন্নাহের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিই ইমামতি করবে”*** এমন কথা বলার পরেও আবূ বকরকে যেহেতু তিনি ইমামতির জন্য সামনে এগিয়ে দিয়েছেন, তাই বুঝা গেল যে, আবূ বকরই ছিলেন তাদের মাঝে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ কারী এবং সুন্নাহের সর্বোচ্চ জ্ঞানী, যেহেতু তারা কুরআনের কোনো অংশকে অতিক্রম করে ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অংশটুকুর যাবতীয় অর্থ বুঝে সেই অনুসারে আমল না

করতেন, যেমনটি ইবনু মাসঊদ বলেছেন: যখন আমাদের মধ্য কেউ কুরআনের দশটি আয়াত শিক্ষা করতেন, তখন সে উক্ত আয়াতগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত অতিক্রম করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আয়াতগুলোর অর্থ বুঝে সেই অনুসারে আমল না করতেন।

ইমাম মুসলিম সাহাবী আবূ মাসঊদ আল-বদরী থেকে এই হাদীসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ***"জামাআতের ইমামতি ঐ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে জানে। যদি তারা পড়াতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ (হাদীস) বেশী জানে সে (ইমামতি করবে)। অতঃপর তারা যদি সুন্নাহতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে হিজরতকারী। যদি হিজরতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে' সর্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করছে সে (ইমামতি করবে)।"***

কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে ইমামতি করবে না এবং তার বাড়ীতে তার নিজস্ব চেয়ারেও বসবে না, তার অনুমতি ব্যতীত। সহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে: ***"তোমাদের মাঝে সর্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি তোমাদের ইমামতি করবে।"*** ইবনু মাসঊদের কোনো কোনো বর্ণনাতে এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে: ***"যদি তারা হিজরতের ক্ষেত্রে সমান হয়, তাহলে তাদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রগামী ব্যক্তি ইমাম হবে।"*** আর যে বিনিময় নিয়ে সালাতের ইমামতি করে তার পিছনে সালাত আদায় করা যাবে না।

আবূ দাউদ বলেন: আহমাদকে এমন ইমাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে দাবি করে: আমি রমাদান মাসে এত এত পরিমাণ টাকার বিনিময়ে তোমাদের সালাতের ইমামতি করবো, তখন তিনি বললেন: আমি আল্লাহর কাছে এমন ব্যক্তি থেকে মুক্তি চাচ্ছি, কে এমন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবে?! স্থানীয় ইমাম – প্রত্যেক মাসজিদের জন্য নিয়োজিত ইমাম – ব্যতীত অন্য কোনো কিয়াম করতে

অক্ষম ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবে না, যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তারা তার পিছনে বসেই সালাত আদায় করবে, আর যদি ইমাম নাপাক অবস্থায় অথবা শরীরে বা পোশাকে নাপাকী নিয়ে সালাত আদায় করে আর সালাত শেষ হওয়ার পূর্বে তা জানা না যায়, তাহলে এই ক্ষেত্রে মুকতাদীগণের জন্য সালাত পুনরায় আদায় করা জরুরী নয়, আর শুধুমাত্র ইমাম নিজে নাপাক থাকাবস্থায় পুনরায় সালাত আদায় করে নিবে, এমন সম্প্রদায়ের ইমামতি করা ইমামের জন্য মাকরূহ হবে, যেই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি তাকে সঠিক কারণে অপছন্দ করে, অযুকারী ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির পিছনে ইকতিদা করা সহীহ।

সুন্নাত হচ্ছে মুকতাদীগণ ইমামের পিছনে দাঁড়াবে, দলীল হল জাবির ও জাব্বার এর হাদীস, যখন তারা তাঁর ডানে ও বামে দাঁড়ালেন, তিনি তাদের উভয়ের হাত ধরে তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু মাসঊদ কর্তৃক আলকামা ও আসওয়াদকে দুই পাশে রেখে সালাত আদায়ের ব্যাপারে ইবনু সীরীন বলেছেন: সেখানে জায়গা সংকীর্ণ ছিল। আর যদি মুকতাদী একজন হয়, তাহলে ইমামের ডানে দাঁড়াবে, আর যদি সে বামে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে ইমাম তার তাকবীরে তাহরীমা নষ্ট না করে তাকে সরিয়ে ডান দিকে নিয়ে আসবে, আর যদি কেউ একজন পুরুষ ও একজন নারীর ইমামতি করে তাহলে পুরুষ ব্যক্তিটি তার ডানে দাঁড়াবে আর মহিলাটি তার পেছনে দাঁড়াবে; যেহেতু আনাসের হাদীসে এসেছে, যা মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ইমামের নিকটতম কাতারে অবস্থান করা অধিক উত্তম, এমনিভাবে কাতারগুলোর একটি অপরটির কাছাকাছি থাকাটা অধিক উত্তম, এমনিভাবে তার (ইমাম) কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়ানো অধিক উত্তম; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***“ইমামকে কাতারের মধ্যবর্তী স্থানে রাখো এবং তোমাদের মধ্যবর্তী ফাঁকাগুলো পূর্ণ করো।”***

শিশুদের কাতার সহীহ হওয়া সংক্রান্ত দলীল হল আনাসের হাদীস: আমি আর ইয়াতীম বালকটি তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম আর বৃদ্ধা মহিলাটি আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। আর যদি মুকতাদী পৃথকরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইকতিদা করে, তাহলে তার জামা'আতের সাথে সারিবিদ্ধ হওয়াটা সহীহ হবে না। আর যদি মুকতাদী ইমামকে অথবা তার পেছনে দাঁড়ানো ব্যক্তিকে দেখতে পায়, তাহলে তার ইকতিদা সহীহ হবে, যদিও সারিগুলো পরস্পর মিলিত না থাকে, এমনিভাবে যদি সে (মুকতাদী) উভয়ের কোনো একজনকে দেখতে না পায় কিন্তু তাকবীরের আওয়াজ শুনতে পায়, তাহলেও ইকতিদা সহীহ হবে, যেহেতু তাকবীর শুনে ইকতিদা করাটা সম্ভব, যেভাবে চাক্ষুস দেখে ইকতিদা করা সম্ভব। আর যদি উভয়ের মাঝে কোন রাস্তা বিদ্যমান থাকে, যার কারণে কাতারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে ইকতিদা সহীহ হবে না, আর মুওয়াফফাকুদ্দীন (ইবনু কুদামাহ) ও অন্যান্যরা কাতারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টিকে ইকতিদা সহীহ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন না; যেহেতু এই বিষয়ে কোনো নছ ও ইজমা পাওয়া যায় না। ইমামের জন্য মুকতাদীদের থেকে উঁচু স্থানে অবস্থান করা মাকরূহ, ইবনু মাসঊদ হুযায়ফাকে বলেছিলেন: তুমি কি জানো না যে, তাদেরকে উক্ত বিষয় থেকে নিষেধ করা হতো? তিনি বললেন: অবশ্যই। বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সনদে ইমাম শাফেয়ী এটিকে বর্ণনা করেছেন। তবে মিম্বারের সিড়ির ন্যায় সামান্য উঁচু হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই; যেহেতু সাহলের হাদীসে এসেছে: নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** মিম্বারের উপরে সালাত আদায় করেছেন এরপরে সেখান থেকে পিছনে ফিরে নেমে এসেছেন ও সিজদা করেছেন। (হাদীস) মুকতাদীর উঁচু স্থানে দাঁড়ানোতে কোনো সমস্যা নেই কেনো না, আবূ হুরায়রা ইমামের ইকতিদা করে মাসজিদের ছাদে সালাত আদায় করেছেন, হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন, ফরয সালাত শেষ করে একই স্থানে দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করা ইমামের জন্য মাকরূহ; যেহেতু মুগীরাহ এর সূত্রে বর্ণিত মারফূ' হাদীসে এসেছে: যা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আহমাদ বলেছেন: আমি হাদিসটি আলী ব্যতীত

অন্য কারো থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে জানি না। মুকতাদী ইমামের পূর্বে প্রস্থান করবে না, দলীল হল নাবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** এর বাণী: ***“তোমরা রুকু, সিজদা এবং প্রস্থানের ক্ষেত্রে আমার থেকে অগ্রগামী হয়ো না।”*** ইমাম ব্যতীত অন্য সকলের জন্য মসজিদের নির্দিষ্ট কোনো স্থানকে ফরয আদায়ের জন্য ধার্য করে নেওয়া মাকরূহ হবে, যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** উটের ন্যায় কোনো স্থানকে স্থায়ীভাবে (সালাতের জন্য) ধার্য করতে নিষেধ করেছেন। জামা‘আত ও জুমু‘আর সালাত পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে অসুস্থ, সম্পদ হারিয়ে বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভয়কারী অথবা সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির উযর গ্রহণযোগ্য হবে; কারণ এমন পরিস্থিতিতে আপতিত আপদ বৃষ্টির পানিতে কাপড় ভিজে যাওয়ার আপদের চেয়ে অধিক বড়, আর এটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য উযর; যেহেতু উমার এর বক্তব্য হচ্ছে: ঠাণ্ডা রাতে অথবা সফরকালে বৃষ্টির রাতে নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** ঘোষক এই ঘোষণা দিতেন: ***“তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করে নাও।”*** বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আর তারা উভয়েই ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি স্বীয় মুয়াজ্জিনকে বৃষ্টিস্নাত জুম‘আর দিনে বলেছিলেন: ***“যখন তুমি ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ’ বলবে, তখন ‘হায়্যা আলাছ সালাহ’ বলো না। তুমি তখন বলবে: ‘সল্লূ ফী বুয়ূতিকুম’ (তোমরা তোমাদের বাসস্থানে সালাত আদায় করে নাও)।”*** তখন মানুষ এটাকে খারাপ মনে করতে লাগলে, তিনি বললেন: আমার থেকে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি – অর্থাৎ আল্লাহর রসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** – এটা করেছেন। আর আমি তোমাদেরকে কাঁদামাটি ও পিচ্ছিল স্থান দিয়ে নিয়ে আসাকে অপছন্দ করেছি। যে পিঁয়াজ অথবা রসুন খেয়েছে, তার জন্য মসজিদে আসা মাকরূহ, যদিও সে মানুষের থেকে দূরে অবস্থান করে; কারণ এতে করে ফেরেশতাদের কষ্ট হয়।

অধ্যায়: উযরগ্রস্তদের সালাত

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ফরয সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা আবশ্যক। যেহেতু ইমরানের হাদীসে এসেছে ***“দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তা না পারলে বসে, যদি তাও না পার তাহলে পার্শ্বের ওপর।”*** এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন। নাসায়ী এই বক্তব্যটি আরো বৃদ্ধি করেছেন: ***“আর যদি তাও না পার, তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে (পিঠে ভর করে) সালাত আদায় করো,”*** আর রুকু ও সিজদার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব হয় মাথা দ্বারা ইশারা করে তা আদায় করবে। যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** এর বাণী: ***“আর আমি তোমাদের যে আদেশ দিয়ে থাকি তা তোমরা সাধ্য অনুযায়ী পালন করো।”***

কাঁদা অথবা বৃষ্টির কারণে ময়লা লেগে যাওয়ার ভয়ে স্থির অথবা চলন্ত সাওয়ারীর উপরে বসে ফরয সালাত আদায় করা সহীহ হবে; যেহেতু ইয়া‘লা ইবন উমাইয়্যার হাদীসে রয়েছে: যা তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেন: এই মতের উপরেই আলেমগণ আমল করে থাকেন।

আর মুসাফির শুধু চার রাকাত সালাতেই কসর করবে। আর রমাদান মাসে তার জন্য সিয়াম না রাখার অনুমতি আছে। আর যদি সে এমন ব্যক্তির ইকতিদা করে, যার জন্য সালাত পূর্ণ করা আবশ্যক, তাহলে সেও সালাত পূর্ণ করবে। আর যদি কোনো স্থানে কোনো প্রয়োজনে ইকামতের নিয়ত ছাড়াই অবস্থান করে, আর সে এটাও জানে না যে, কবে তার প্রয়োজন পূর্ণ হবে, অথবা তাকে বৃষ্টি অথবা

অসুস্থতা আটকে রাখে, তাহলে সে এই স্থানে সবসময় কসর করতে পারবে। সফরের সাথে সংযুক্ত বিধানগুলো হল চারটি: কসর করা ও একত্রে দুই ওয়াক্তের সালাত আদায় করা, মোজার উপরে মাসাহ করা এবং সিয়াম না রাখা।

যোহর ও আছরের সালাত এবং মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে উভয় ওয়াক্তের যে কোন এক ওয়াক্তে আদায় করা মুসাফিরের জন্য জায়িয আছে। আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতীত অন্য সকল স্থানে এবং একত্রে দুই ওয়াক্তের সালাত আদায় না করলে অসুস্থতার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এমন অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া অন্য সকলের জন্য দুই সালাত একত্রে না আদায় করাটা অধিক উত্তম। কারণ নাবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** কোনো প্রকার ভয় ও সফর ব্যতীতই দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করেছেন, আর মুস্তাহাযা নারীর জন্য একত্রে আদায় করার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে, যেহেতু এটাও এক প্রকার রোগ। আহমাদ দলীল পেশ করেছেন যে, অসুস্থতার সমস্যা সফরের চেয়েও বেশী কষ্টকর। তিনি আরো বলেছেন: নিজ অঞ্চলে বা বাড়ীতে থাকাকালে কোন বিশেষ প্রয়োজনে অথবা বিশেষ ব্যস্ততাজনিত কারণে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা যেতে পারে। তিনি আরোও বলেছেন: নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** থেকে সালাতুল খাওফ বিশুদ্ধরূপে সাব্যস্ত হয়েছে ছয়টি অথবা সাতটি পদ্ধতিতে, যেগুলোর সবই জায়িয, তবে সাহল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসটি আমি গ্রহণ করি। সাহাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত সালাতুল খাওফ হল যাতুর রিকা' যুদ্ধের সালাতুল *খাওফ। "একদল তাঁর (নবী) সাথে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর আরেক দল শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করছিল। এমন অবস্থায় তার সাথে সারিবদ্ধ হওয়া দলটি এক রাকাত আদায় করলো, এরপরে তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আর এই দলটি তাদের সালাত সম্পন্ন করে সেখান থেকে উঠে যায় এবং শত্রুদলের মুখোমুখি হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। এমন সময় অপর দলটি আসে, যাদেরকে নিয়ে তিনি নিজের অবশিষ্ট রাকাতটি আদায় করে বসে যান, আর তারা নিজেদের সালাত সম্পন্ন করে নেয় এরপরে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরান।"* মুত্তাফাকুন আলাইহি, আর তার (ইমাম) জন্য এটা জায়িয আছে যে,

তিনি প্রত্যেক দলকে সাথে নিয়ে পৃথকরূপে সালাত আদায় করবেন এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সালাম ফিরাবেন। হাদীসটি আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন। এই সালাতে অস্ত্র সাথে রাখা মুস্তাহাব, দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী: অর্থ:

﴿ ...وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ ...﴾[النساء: 102]

"তারা যেনো নিজ নিজ অস্ত্র সাথে নিয়ে নেয়।" আর যদি অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখাকে ওয়াজিব বলা হয় তাহলে সেই মতেরও একটি যৌক্তিক দলীল আছে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা (সতর্ক থাকার আদেশ দিয়ে) বলেছেন:

﴿ ... وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذٗى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ...﴾[النساء: 102]

"যদি বৃষ্টির কারণে অথবা তোমরা অসুস্থ হওয়ার কারণে অস্ত্র বহন করতে না পার, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।"

যদি মারাত্মক পর্যায়ের কোনো ভয় সৃষ্টি হয়, তাহলে পদাতিক ও আরোহী অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে এবং ভিন্ন দিকে মুখ করেও সালাত আদায় করতে পারবে দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ...﴾[البقرة: 239]

"আর যদি তোমরা ভয় করো তাহলে পায়ে হেঁটে বা বাহনে চড়ে।" এমন সালাত যথাসাধ্য ইশারার মাধ্যমে আদায় করতে হবে, আর সিজদা রুকুর চেয়ে

অধিক নিচু হবে, আর এই সালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করা জায়িয হবে না, যখন অনুসরণ করা সম্ভব না হবে।

অধ্যায়: জুমু‘আর সালাত

জুমু‘আর সালাত এমন প্রত্যেক বালেগ বুদ্ধিমান, স্বাধীন, মুসলমান পুরুষ ব্যক্তির উপরে ফরযে আইন, যে এমন বাড়ীতে বসবাসকারী যেই স্থানকে একটি নামেই ডাকা যায় (অর্থাৎ স্থায়ী কোন জায়গার নাগরিক)। আর যদি এমন কেউ জুমু‘আর সালাতে উপস্থিত হয়, যার উপরে তা ওয়াজিব নয়, তবে এমন ব্যক্তির জন্যও জুমু‘আ যথেষ্ট হবে। আর যদি কেউ এক রাকাত পায়, তাহলে সে বাকী রাকাত আদায় করবে জুমু‘আর সালাত হিসেবে, অন্যথায় সেই সালাত সে যোহরের সালাত হিসেবে পূর্ণ করবে। (জুমু‘আর জন্য) এমন দুইটি খুতবা উপস্থাপন করা জরুরী, যেগুলোর মাঝে আল্লাহর প্রশংসা, দুইটি সাক্ষ্য এবং হৃদয়কে নাড়া দেয় এমন কথা বিশিষ্ট উপদেশ বিদ্যমান থাকতে হবে, এমন বক্তব্যকে খুতবা বলা হয়, আর খুতবা দিতে হবে মিম্বারের উপরে অথবা কোনো উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে, ইমাম মুকতাদীদেরকে সালাম দিবে যখন ঘর থেকে বের হবে এবং তাদের সামনে এসে উপস্থিত হবে, এরপরে আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকবে, দলীল হল ইবনু উমারের হাদীস, যা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন দুই খুতবার মাঝে অল্প সময়ের জন্য বসবে, যেহেতু সহীহাইনে বর্ণিত ইবনে উমারের হাদীস রয়েছে এ ব্যাপারে, আর দাঁড়িয়ে খুতবা দিবে; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** এমনটিই করেছেন। ইমাম মুসল্লীদের দিকে তাকিয়ে খুতবা দিবে এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করবে। জুমু‘আর সালাত দুই রাকাত, যেখানে উভয় রাকাতেই উচ্চ স্বরে কিরাআত পাঠ করতে হবে। প্রথম রাক‘আতে সুরাতুল জুমু‘আ পাঠ করবে আর দ্বিতীয় রাক‘আতে মুনাফিকুন অথবা সাব্বিহিসমা রাব্বিয়াল ‘আলা (সুরা আ’লা) ও গাশিয়াহ পাঠ করবে। সবগুলোই সহীহ হাদীস

দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর জুমু‘আর দিনের ফজরের সালাতে আলিফ-লাম-মিম আস সাজদাহ এবং হাল আতা ‘আলাল ইনসান (সুরা আদ দাহার) পাঠ করবে, তবে এই আমল ধারাবাহিকভাবে (নিয়মিত) করাটা মাকরূহ। আর যদি কোনো ঈদ আর জুমু‘আ এক সাথে এসে যায়, তাহলে ঈদের সালাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের থেকে জুমু‘আর সালাত রহিত হয়ে যাবে। তবে ইমামের থেকে রহিত হবে না। জুমু‘আর পরে সুন্নাত হল দুই অথবা চার রাকাত সালাত, আর জুমু‘আর পূর্বে কোনো সুন্নাত সালাত নেই, তবে ইচ্ছামত কয়েক রাকাত নফল আদায় করাটা মুস্তাহাব।

জুমু‘আর সালাতের জন্য গোসল করা, মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা, সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করা, আগে আগে পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাওয়া সুন্নাত। স্থিরতা ও প্রশান্তরূপে দ্বিতীয় আযানের সাথে সাথে মাসজিদ পানে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া ওয়াজিব। ইমামের কাছাকাছি অবস্থান করবে, এই দিন বেশী বেশী দু’আ করবে এই আশায় যে, দু’আ কবুল হওয়ার সেই কাংখিত মুহূর্তটি দু’আর সাথে মিলে যেতে পারে, তবে সবচেয়ে কাংখিত সময় হল আছরের সালাতের পরে সর্বশেষ মুহূর্ত, যেই মুহূর্তে পবিত্র হয়ে মাগরিবের সালাতের অপেক্ষা করা হয়; কারণ এই সময় অপেক্ষাকারী সালাতের মাঝে আছে বলেই ধরে নেওয়া হয়, জুমু‘আর দিনে ও রাতে বেশী বেশী নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** উপরে দুরুদ পাঠ করবে। মানুষদেরকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া মাকরূহ, তবে মাজলিসের মাঝে কোথাও শূণ্য জায়গা দেখতে পেলে সেখানে এভাবে যাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই, যদি সেখানে মানুষদেরকে না ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয়। অন্যকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার স্থানে বসা যাবে না, যদিও সে নিজের মালিকানাধীন দাস অথবা সন্তান যেই হোক না কেন। আর যে ইমাম খুতবা দেওয়ার সময়ে মসজিদে প্রবেশ করবে, সে অল্প সময়ের মধ্যে দুই রাকাত সালাত আদায় না করে বসবে না। খুতবার সময় কোনো কথা বলা যাবে না, কোনো প্রকার অনর্থক কাজ করা যাবে না। যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি**

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ***“যে ব্যক্তি কংকর স্পর্শ করল সে অনর্থক কাজ করল।”*** তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। যার তন্দ্রা আসবে, সে তার বসার স্থান থেকে উঠে অন্য স্থানে যেয়ে বসবে, যেহেতু এই বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ আছে, যেই হাদীসটিকে তিরমিযী সহীহ বলেছেন।

অধ্যায়: দুই ঈদের সালাত

যখন সূর্য মধ্যাকাশ থেকে সরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ঈদ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়নি, তখন পরের দিন ঈদ্গাহে যেয়ে মানুষদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতে হবে। ঈদুল আযহার সালাত দ্রুত আদায় করে নেওয়া আর ঈদুল ফিতরের সালাত দেরী করে আদায় করা সুন্নাত। আর ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই বেজোড় সংখ্যক কিছু খেজুর খাওয়া সুন্নাত, আর ঈদুল আযহায় সালাত আদায় করার আগ পর্যন্ত কিছুই খাবে না। যখন ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে গমন করবে, অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসবে। নিকটবর্তী কোনো মরুতে (বড় খোলা মাঠ) ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত। দুই রাকাত সালাত আদায় করতে হবে, যাতে তাকবীরে তাহরীমার পরে ছয় তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে, প্রত্যেক তাকবীরেই দুই হাত উত্তোলন করতে হবে এবং উভয় রাকাতে ধারাবাহিকভাবে সাব্বিহিসমা ও গাশিয়াহ সুরা পাঠ করবে, এরপরে সালাত শেষে খুতবা পাঠ করবে। ঈদ্গাহে ঈদের সালাতের আগে ও পরে কোনো নফল সালাত আদায় করা যাবে না। উভয় ঈদে তাকবীর দেওয়া, মসজিদে ও রাস্তায় প্রকাশ্যে তাকবীর দেওয়া, আর গ্রামবাসী ও শহরবাসীদের পক্ষ থেকে উচ্চ স্বরে তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। দুই ঈদের রাত্রিতে এবং ঈদগাহে যাওয়ার পথে তাকবীর দেওয়া আরো গুরুত্বপূর্ণ। কুরবানীর ঈদে যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশদিনের শুরু থেকেই সাধারণ তাকবীর পাঠ করতে হয়, আর আরাফার দিবসের ফজরের সালাত

থেকে তাশরীকের শেষ দিবস পর্যন্ত বিশেষভাবে তাকবীর দিতে হয়, আর এই দশ দিনে আমলে সালিহ (ভালকাজের) এর জন্য অত্যাধিক সাধনা করা সুন্নাত।

অধ্যায়: সূর্যগ্রহণের সালাত

এই সালাতের সময় হল সূর্যগ্রহণের সময় থেকে সূর্য উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত। এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বাড়ীতে অথবা সফরে অবস্থানকালে সর্বাবস্থায় এমনকি মহিলাদের জন্যও। আল্লাহর যিকর, দু'আ, ইস্তিগফার, আযাদ ও সদকা করা সুন্নাত। যদি একবার সালাত আদায় করা হয়, তাহলে সূর্য পরিষ্কার না হলেও সালাত দ্বিতীয়বার আদায় করা যাবে না; বরং তারা আল্লাহর যিকর করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের আলো পরিষ্কারভাবে দেখা না যায়। এই সালাতের ঘোষণা হবে এমন: ***"আস-সালাতু জামি'আহ"***, অর্থ: ***"সালাত সংঘটিত হতে যাচ্ছে।"*** দুই রাকাত সালাত আদায় করবে, যেখানে উভয় রাকাতেই উচ্চ স্বরে কিরাআত পাঠ করবে, আর কিরাআত, রুকু ও সিজদা দীর্ঘ হবে। প্রত্যেক রাকাতে দুইটি করে রুকু হবে; কিন্তু দ্বিতীয় রুকুটা প্রথমটার চেয়ে কম দীর্ঘ হবে, এরপরে তাশাহহুদ পাঠ করে সালাম ফিরাতে হবে, আর যদি সালাতের মাঝেই সূর্য পরিষ্কার হয়ে যায়, তাহলে অল্প সময়েই সালাত শেষ করে দিবে। যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***"তোমরা সালাত আদায় করতে থাকো এবং দু'আ করতে থাকো; যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উপরে আসা এই আপদ দূর না হয়।"***

অধ্যায়: বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত

এই সালাত মুকিম ও সফরে সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, এই সালাত আদায়ের নিয়ম হল ঈদের সালাত আদায়ের ন্যায়, দিবসের প্রথমাংশে সালাতটি আদায় করা সুন্নাত। এই সালাত আদায়ের জন্য বিনয়ের সঙ্গে অবনত হয়ে মিনতি করতে করতে ঘর থেকে বের হতে হবে। কেননা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসে এসেছে, যা তিরমিযী সহীহ বলেছেন, ইমাম মুকতাদীরকে নিয়ে সালাত আদায় করে একটি খুতবা পাঠ করবেন, যেই খুতবায় অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার ও দু’আ বিদ্যমান থাকবে আর ইমাম দুই হাত তুলে অধিক পরিমাণে দু’আ করতে থাকবে এবং এই দু‘আগুলো পাঠ করবে: ***“হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনি মুষলধারে বহমান তৃপ্তিদায়ক, আনন্দদায়ক, উৎপাদনশীল, পর্যাপ্ত পরিমাণ, সর্বব্যাপী, অঝোর ধারায়, স্তরে স্তরে প্রবাহিত, স্থায়ী-উপকারী, আপদ মুক্ত ও তাৎক্ষণিকভাবে ও বিলম্ব না করে বৃষ্টি দান করুন।"***

”اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً غدقاً مجللا سحاً عاماً طبقاً دائماً نافعاً غير ضار عاجلا غير آجل "

অর্থ: ***“হে আল্লাহ, আপনি আপনার বান্দা ও চতুষ্পদ জন্তুদেরকে পানি পান করান, আপনার রহমত বিস্তৃত করে দিন, আপনার মৃত শহরকে উর্বর করে দিন, হে আল্লাহ, আমাদেরকে মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টির পানি দান করুন আর আমাদেরকে নিরাশাগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। হে আল্লাহ! (আমরা) রহমতের বৃষ্টি চাই, আযাব, বিপদ, ধ্বংস ও নিমজ্জিতকারী বৃষ্টি চাই না। ”***

"اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك"

অর্থ: ***“হে আল্লাহ, আপনার বান্দাদের উপরে এবং শহরগুলোতে এমন আপদ, দুর্দশা ও সঙ্কট আপতিত হয়েছে, যেগুলোর অভিযোগ একমাত্র আপনি ছাড়া আর কারো কাছে আমরা করতে পারি না।”***

"اللهم أنبت لنا الزرع ، وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدراراً"

অর্থ: ***“হে আল্লাহ, আমাদের যমীনগুলোতে (অধিকমাত্রায়) ফসল দান করুন, আমাদের পশুগুলোর স্তনে অধিক পরিমাণে দুধ দান করুন, আমাদের প্রতি আসমানের বরকতসমূহ বর্ষণ করুন এবং আমাদের প্রতি আপনার যাবতীয় বরকত নাযিল করুন! হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, নিশ্চয় আপনি অধিকমাত্রায় ক্ষমাশীল, সুতরাং আমাদের প্রতি অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করুন।”***

মুস্তাহাব হল খুতবার মাঝে কিবলামুখী হওয়া, এরপরে চাদরের দিক পরিবর্তন করে ডান দিকের চাদর বাম দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া আর বাম দিকের চাদর ডান দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া। কারণ নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** মানুষের দিকে পিঠ রেখে কিবলার দিকে মুখ করে তারপরে চাদর উল্টিয়েছিলেন। মুত্তাফাকুন আলাইহি। কিবলামুখী হওয়ার সময় নিম্ন স্বরে দু’আ করবে, আর যদি তারা সালাতের পরে অথবা জুমু‘আর খুতবার মাঝে বৃষ্টি প্রার্থনা করে, তাহলে তারা সুন্নাত যথাযথভাবে পালন করেছে বলে বিবেচিত হবে, বৃষ্টি শুরুর প্রথম পর্যায়ে (মাঠে) দাঁড়িয়ে থাকা এবং আসবাবপত্র ও পোষাকসমূহ বের করে রাখা

মুস্তাহাব, যাতে করে সেগুলোতে বৃষ্টির পানি লাগে আর বৃষ্টি অধিক প্রবাহমান হলে উপত্যকা অঞ্চলে চলে যেতে হবে, আর অযু করতে হবে আর বৃষ্টি দেখার সময় এই দু'আ পাঠ করতে হবে:

" اللهم صيباً نافعاً "

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাদেরকে উপকারী মুষলধারে বৃষ্টি দান করুন।" আর যখন পানির মাত্রা অধিক বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিবে, তখন এই দু'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব:

" اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر"

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাদের পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোতে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ! ছোট টিলা, ক্ষুদ্র পাহাড়, উপত্যকাগুলোর অভ্যন্তরে এবং বনাঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষণ করুন।" বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার সময় দু'আ করবে আর বলবে:

"مطرنا بفضل الله ورحمته وإذا رأى سحاباً أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره"

আমরা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কারণে বৃষ্টি পেয়েছি। আর যখন মেঘ দেখবে অথবা কোন বাতাস বয়ে যেতে দেখবে, তখন আল্লাহর নিকট সেই মেঘ বা বাতাসের কল্যাণ কামনা করবে এবং সেই বস্তুর অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর বাতাসকে গালি দেওয়া জায়িয নেই বরং এই সময় বলতে হবে:

"اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً ، اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً ،"

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই বাতাসের কল্যাণ, এর মাঝে বিদ্যমান বস্তুর কল্যাণ এবং এই বাতাসের সঙ্গে প্রেরিত কল্যাণ কামনা করছি। আর আপনার নিকট এই বাতাসের অকল্যাণ, এর মধ্যে বিদ্যমান অকল্যাণ এবং এর সাথে প্রেরিত অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি এটাকে (আমাদের জন্য) রহমত বানিয়ে দিন, এটাকে আমাদের জন্য শাস্তির কারণ বানাবেন না। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী বাতাসে রূপান্তর করে দিন, ঝড়ো বাতাসে রূপান্তর করে দিয়েন না।” আর যখন বজ্রধ্বনি অথবা বজ্রাঘাতের গর্জন কানে আসবে তখন এই দু’আটি পাঠ করবে:

"اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته "

অর্থ: “হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার গযব দ্বারা নিঃশেষ করবেন না এবং আপনার আযাব দ্বারা ধ্বংস করবেন না, আমাদেরকে এর পূর্বেই বিপদ থেকে মুক্তি দান করুন। আমি ঐ মহান সত্তার পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছি, বজ্রধ্বনি যার প্রশংসাপূর্ণ মহত্ব বর্ণনা করে, এবং ফেরেশতাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যার বড়ত্বের ঘোষণা করে। ” আর যখন গাধার ডাক অথবা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট শয়তানের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, আর যখন মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করবে।

অধ্যায়: জানাযা

সর্বসম্মতিক্রমে চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়, সেঁক বা দাহন জাতীয় চিকিৎসা মাকরূহ, খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চিকিৎসা মুস্তাহাব। হারাম খাবার বা পানীয় দ্বারা ও বিনোদনমূলক গান-বাদ্য দ্বারা চিকিৎসা করা হারাম। যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন:

“হারাম বস্তু দ্বারা তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো না।” তামিমা তথা তাবিজ করযের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করা হারাম। তামীমা হল এমন রক্ষাকবচ অথবা মাদুলি, যা লটকিয়ে রাখা হয়। বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং রোগীকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত। রোগী আল্লাহর প্রশংসা করে কোনো অভিযোগ ছাড়া তার কষ্টের কথা বলতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নেই। রোগে-শোকে ধৈর্যধারণ করা ফরয, আর আল্লাহর নিকট অভিযোগ ধৈর্যের বিপরীত নয়; বরং এটা আসল উদ্দেশ্য। আর আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ফরয। কোনো বিপদে আপতিত হয়ে মৃত্যু কামনা করা যাবে না।

রোগীকে দেখতে যাওয়া ব্যক্তি রোগীর জন্য সুস্থতার দু‘আ করবে। যখন রোগীর ওপর মৃত্যুর আলামত দেখা যাবে তখন তার জন্যে মুস্তাহাব হবে *“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু”* এর তালকিন দেওয়া, তাকে কিবলাভিমুখী করে দিবে। আর সে মারা গেলে তার উভয় চোখ বন্ধ করে দিতে হবে। তার পরিবারকে শুধু উত্তম কথাই বলতে হবে; কারণ ফেরেশতাগণ তাদের কথার উপরে আমীন বলতে থাকে। তাকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দিতে হবে, দ্রুত তার ঋণ পরিশোধ করা হবে এবং মানত অথবা কাফফারা ইত্যাদি বিষয় থেকে তার দায়ভার মুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: *“মুমিনের আত্মা তার ঋণের সাথে ঝুলন্ত; যতক্ষণ না তা আদায় না করবে।”* তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন। তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা দ্রুত করতে হবে। যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: অর্থ: *“কোন মুসলিমের মৃতদেহ তার পরিবারের সামনে আটকে রাখা উচিত নয়।”* হাদীসটি আবু দাঊদ বর্ণনা করেছেন না‘ঈ করা মাকরুহ। না’ঈ হল মৃতব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা দেওয়া। তাকে গোসল দেওয়া, তার জানাযার সালাত সম্পন্ন করা, তাকে বহন করা, কাফন দেওয়া এবং কিবলার দিকে মুখ করে দাফন করা ফরযে কিফায়া। এগুলোর যেকোন একটি কর্মের

বিপরীতে পারিশ্রমিক নেওয়া এবং মৃতব্যক্তিকে প্রয়োজন ব্যতিরেকে অন্য শহরে বহন করে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ। গোসল প্রদানকারীর জন্য সুন্নাত হল অযুর ও ডান দিকের অঙ্গগুলো দ্বারা গোসল শুরু করা, সে তাকে তিনবার অথবা পাঁচবার গোসল দিবে, তবে একবার দিলেও যথেষ্ট হবে, যদি চার মাসের অধিক বয়সের অসম্পূর্ণ শিশু জন্ম নেয়, তাহলে তাকে গোসল দিতে হবে; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: অর্থ: ***"অসম্পূর্ণ শিশুর জানাযার সালাত আদায় করা হবে, তার মা-বাবার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করতে হবে।"*** তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের বাক্যটি এরূপ: ***"শিশুটির জানাযার সালাত আদায় করা হবে।"*** পানি না থাকা বা অন্য কোন কারণে যদি কাউকে গোসল দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে যায়, তবে তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিতে হবে, কাফনের ক্ষেত্রে এমন একটি কাপড় ওয়াজিব, যা তার পুরো দেহকে ঢেকে দেয়, যদি পুরো দেহ ঢাকার মত কাপড় না থাকে, তাহলে আগে সতর ঢেকে তারপরে মাথা ও অবশিষ্ট অঙ্গগুলো ঢাকবে, আর অন্যান্য অঙ্গগুলোতে ঘাস অথবা গাছের পাতা বিছিয়ে দিবে। ইমাম সালাতের সময় পুরুষের বুক বরাবর দাঁড়াবে আর মহিলার মাঝ বরাবর দাঁড়াবে, এরপরে তাকবীর দিবে, তারপরে ফাতিহা পাঠ করে তাকবীর দিবে, এরপরে নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** উপরে দুরুদ পাঠ করে আবার তাকবীর দিবে, এরপরে মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ পাঠ করে চতুর্থ তাকবীর দিবে, এরপরে কিছুক্ষণ দেরী করে ডান দিকে একটি সালাম ফিরাবে। প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠাবে, জানাযা না উঠানো পর্যন্ত সকলেই নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে এটা (এই আমল) উমার থেকে বর্ণিত। যার জানাযার সালাত আদায় করা হয়নি, তার জন্য মুস্তাহাব হল মৃতব্যক্তিকে কবরের রাখার পরে অথবা দাফন করার পরে এক মাস সময়ের মধ্যে জামা'আতের সাথে হলেও জানাযার সালাত কবরের কাছে

যেয়ে আদায় করে নিবে, রাত্রে দাফন করাতে কোনো সমস্যা নেই, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও সূর্য মধ্যাকাশে থাকাবস্থায় দাফন করা মাকরূহ।

যতটা দ্রুত সম্ভব দোড়-ঝাঁপ না করে স্বাভাবিক দ্রুততম সময়ে দাফন করতে যাওয়া সুন্নাত। জানাযার পেছনে চলমান ব্যক্তিদের জন্য জানাযা দাফনের উদ্দেশ্যে মাটিতে রাখার আগ পর্যন্ত বসা মাকরূহ। জানাযার পেছনে গমনকারীকে বিনয়ের সাথে পরকালের পরিণামের চিন্তা করতে করতে চলতে হবে, দুনিয়াবী বিষয়ে আলোচনা করা ও হাসাহাসি করা মাকরূহ, মৃতব্যক্তিকে তার দুই পায়ের দিক থেকে কবরে প্রবেশ করানো মুস্তাহাব হবে যদি তা সহজ হয়। কোন পুরুষের কবর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া মাকরূহ, মহিলার মাহরাম উপস্থিত থাকলে মহিলাকে কোনো পুরুষ কর্তৃক দাফন করা মাকরূহ হবে না। লাহাদ (বগল কবর) কবর শাক (দৃশ্যমান) কবর থেকে অধিক উত্তম। কবর গভীর ও প্রশস্ত করে খনন করা সুন্নাত, সিন্দুক বা কফিনে দাফন করা মাকরূহ। কবরে লাশ রাখার সময় ***“বিসমিল্লাহি ওয়া ‘আলা মিল্লাতি রসূলিল্লাহ”*** বলতে হবে। দাফনের পরে কবরের কাছে দাঁড়িয়ে দু‘আ করা মুস্তাহাব। উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য মৃতব্যক্তির উপরে মাথার দিক থেকে তিন আজলা মাটি নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। এক বিঘত পরিমাণ কবর উঁচু রাখা মুস্তাহাব। এর বেশী উঁচু করলে মাকরূহ হবে। দলীল হল আলীকে লক্ষ্য করে বলা নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** এই বাণী: অর্থ: ***“কোনো মূর্তিকে নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না, আর কোনো উঁচু (সম্মান করা হয় এমন) কবরকে সমান না করে ছাড়বে না।”*** ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। তার উপরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হবে, নুড়ি-কঙ্কর ছড়িয়ে দেওয়া হবে, যা তার মাটিকে সংরক্ষণ করবে, কোন পাথর বা এই জাতীয় বস্তু দ্বারা কবরকে চিহ্নিত করে রাখাতে কোনো সমস্যা নেই; যেহেতু উছমান ইবন মায’উনের কবরের বর্ণনায় এটা সাব্যস্ত হয়েছে। কবর পাকা করা এবং কবরের উপরে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা জায়েয নেই। এর উপরে কোনো স্থাপনা নির্মাণ

করা হলে, তা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। কবরের মাটির উপরে অন্যকিছু অতিরিক্ত রাখা যাবে না; যেহেতু এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞামূলক বর্ণনা এসেছে, হাদীসটি আবু দাঊদ বর্ণনা করেছেন কবরে চুমু দেওয়া, কবরে কোনো জিনিস সংযুক্ত করা, কোনো প্রকার ধূপ দেওয়া, কবরের উপরে বসা এবং কবরের উপরে ধ্যান করা জায়েয নেই। এমনিভাবে কবরের মধ্যেও একই বিধান প্রযোজ্য। কবরের মাটি দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়িয নেই। কবরে প্রদীপ জ্বালানো এবং কবরের উপরে মসজিদ বানানো হারাম, তা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। গোরস্থানে জুতা পরে হাঁটা যাবে না; যেহেতু এই বিষয়ে হাদীসের নিষেধাজ্ঞা আছে। ইমাম আহমাদ বলেছেন: এর সনদ জাইয়্যিদ (ভাল)।

সফর করা ব্যতিরেকে কবর যিয়ারত করা সুন্নাত; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***“তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না।”*** নারীদের জন্য কবর যিয়ারাত জায়েয নেই; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ***“আল্লাহ তা‘আলা কবর যিয়ারতকারী নারী ও কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণকারী ও প্রদীপ প্রজ্বলনকারীদের উপরে লা‘নত বর্ষণ করেছেন।”*** সুনানের সংকলকগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কবরের মাটি শরীরে মালিশ করা, সেখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা এবং (ব্যক্তিগত) দু‘আর উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বরং এগুলো হল শিরকের শাখা-প্রশাখা।

কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রমকারী ও যিয়ারতকারী এই দু‘আ পাঠ করবে:

“السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم المستقدمين منّا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ”

“হে মুমিন সম্প্রদায়, তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক আমরাও আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ব্যক্তিদের প্রতি রহম করুন। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাদের প্রতিদান থেকে মাহরুম করবেন না আর তাদের পরবর্তীতে আমাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করবেন না, আমাদেরকে এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।” জীবিত ব্যক্তিদেরকে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয়ভাবে দেওয়ার অনুমতি আছে।

সালাম আগে দেওয়া সুন্নাত আর এর উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। যদি কোনো ব্যক্তিকে একবার সালাম দেওয়ার পরে তার সাথে দুইবার অথবা তিনবার অথবা আরো বেশী দেখা হয়, তাহলে তাকে আবারও সালাম দিতে হবে, সালাম দেওয়ার সময় মাথা ঝুঁকানো জায়েয নেই। একমাত্র যৌন চাহিদা নেই এমন বয়োবৃদ্ধা ছাড়া কোনো পরনারীকে সালাম দেওয়া যাবে না, কোনো মাজলিস থেকে উঠে আসার সময় সালাম দিবে, আর যখন নিজ পরিবারের কাছে যাবে তখন সালাম দিবে এবং এই দু‘আ পাঠ করবে:

اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا

“হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রবেশ করার কল্যাণ ও বের হওয়ার কল্যাণ প্রার্থনা করছি, আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর উপরে ভরসা করলাম।” মুসাফাহা করা সুন্নাত। এর দলীল হল আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস। তবে নারীর সাথে মুসাফাহা করা জায়েয নেই।

শিশুদেরকে সালাম দিবে। অল্প বয়স্ক, অল্প সংখ্যক ব্যক্তি, চলমান ব্যক্তি এবং আরোহিত ব্যক্তি তাদের বিপরীত ব্যক্তিদেরকে সালাম দিবে। যদি কারো কাছে

অন্য কোনো ব্যক্তির সালাম পৌঁছে, তাহলে তার জন্য এইভাবে উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব হবে:

عليك وعليه السلام

“আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম।”

সাক্ষাৎকারী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেককেই আগে সালাম দেওয়ার জন্য উৎসুক হওয়া মুস্তাহাব, আর আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু এর বেশী বলবে না। হাই উঠলে যতদূর সম্ভব প্রতিহত করে নেওয়ার চেষ্টা করবে, যদি এরপরেও তা এসে যায় তাহলে নিজের মুখ ঢেকে নিবে। আর হাঁচি আসলে চেহারা কাপড় দ্বারা ঢেকে নিবে, আওয়াজ নিম্ন করে ফেলবে এবং উঁচুস্বরে

"الحمد لله"

তথা আল্লাহ তা’আলার প্রশংসা করবে, যা তার সঙ্গীর কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর হাঁচির শ্রোতা বলবে:

" يرحمك الله "

ইয়ারহামুকাল্লাহু বা আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন। আর হাঁচিদাতা এর উত্তরে বলবে:

"يهديكم الله ويصلح بالكم"

“আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং তোমাদের অন্তরকে সংশোধন করে দিন।” আল্লাহর প্রশংসা করে না এমন ব্যক্তিকে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা যাবে না আর যদি সে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার হাঁচি দেয়, তাহলেও তার জন্য রহমতের দু‘আ করবে এবং এরপরে তার সুস্থতার দু‘আ করবে।

যে ব্যক্তি কারো ঘরে প্রবেশ করতে চায়, তাকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে, চাই সে আত্মীয় হোক কিংবা অপরিচিত হোক। যদি সে অনুমতি দেয়, তাহলে ভালো, অন্যথায় তাকে ফিরে যেতে হবে। অনুমতি তিনবার পর্যন্ত চাওয়ার সুযোগ আছে, এর বেশী চাওয়া যাবে না। অনুমতি চাওয়ার নিয়ম হল – আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? কোন মজলিসে গেলে মজলিসের শেষ সীমায় বসে যাবে, দুই জন ব্যক্তির মাঝে কোন জায়গা বের করার চেষ্টা করা যাবে না তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে।

মৃতব্যক্তির কারণে বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করা ও তাকে সান্ত্বনা দেওয়া মুস্তাহাব। শোক প্রকাশের জন্য তার কাছে বসে (দীর্ঘ সময়) থাকা মাকরূহ, শোক প্রকাশকারী কী বলবে সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু নেই, বরং তাকে ধৈর্যধারণের ব্যাপারে উৎসাহী করে তুলবে এবং এর বিনিময়ে তার ছাওয়াবের ওয়াদার কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে, মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করবে আর বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি বলবে:

"الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها،"

অর্থ: "সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লার জন্যে, আমরা আল্লাহরই সৃষ্টি, তাঁরই কাছে ফিরে যাবো, হে আল্লাহ, আমাকে আমার বিপদে উত্তম প্রতিদান দিন এবং তার থেকেও উত্তম বিনিময় দান করুন," আর যদি সে আল্লাহর এই বাণীর উপরে আমল করে সালাত আদায় করে নেয়:

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ﴾[البقرة: 45]

অর্থ: "ধৈর্য আর সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করো," তাহলে তা উত্তম, ইবনু আব্বাস এই আমলটি করেছেন। কারো মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ

করা ওয়াজিব। মৃতব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা মাকরূহ নয়, তবে নিয়াহা (বিলাপ, আর্তনাদ বা মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোনো কিছু আয়োজন করা) হারাম। নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** সালিকাহ, হালিকাহ ও শাক্কাহ থেকে নিজেকে দায়মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সালিকাহ হল এমন নারী, যে বিপদকালে উঁচু আওয়াজে আর্তনাদ করতে থাকে, হালিকাহ হল এমন নারী, যে নিজের চুল ছেটে ফেলে, আর শাক্কাহ হল এমন নারী, যে নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। আর অস্থিরতা প্রকাশ করা হারাম।

অধ্যায়: যাকাত

যাকাত চতুষ্পদ জন্তু, যমীনে উৎপন্ন ফসল, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়ী পণ্যসমূহের মাঝে পাঁচটি শর্তে ফরয হয়: মুসলিম হওয়া, স্বাধীন হওয়া, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া, পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং এক বছর পূর্ণ হওয়া। শিশু ও পাগল ব্যক্তির সম্পদে যাকাত ফরয হয়, যা উমার ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এই বিষয়ে তাদের বিপরীত কোনো মত পাওয়া যায় না। নিসাবের অতিরিক্ত সম্পদের মাঝে হিসাবের মাধ্যমে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত হবে, তবে সায়েমা (বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে বিচরণকারী এমন) পশুর ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, এমন পশুগুলোর মাঝে পরবর্তী নিসাবের পূর্বের সংখ্যাগুলোত ও অনির্দিষ্টরূপে ওয়াকফকৃত সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন মসজিদসমূহ ইত্যাদিতে যাকাত হবে না। নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর ওয়াকফকৃত যমীনের ফসলের উপরে যাকাত ফরয হবে। আর যে কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে ঋণ দিয়ে রেখেছে যেমন ধার-দেনা, মহর ইত্যাদি, এমন সম্পদে যাকাতের অর্থ বছর শুরু হবে ঐ দিন থেকে, যেই দিন সে উক্ত সম্পদের মালিক হয়েছে, তবে যাকাত তখনি দিবে যখন সে তা পূর্ণ বা আংশিক হস্তগত করবে। এটা হল সাহাবীদের ইজমার বাহ্যিক মত; যদিও হস্তগত সম্পদ নিসাব সমপরিমাণ না হয়,

তবে উক্ত সম্পদ হস্তগত করার পূর্বে তা আদায় করে দিলেও যথেষ্ট হবে, যেহেতু সেখানে ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান। তবে হস্তগত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে দেওয়া একটি সুযোগ মাত্র, সুতরাং এটা অগ্রীম যাকাত দেওয়ার মত নয়। আর যদি কারোর কাছে আংশিক নিসাব থাকে আর অবশিষ্ট নিসাব ঋণরূপে থাকে অথবা হারিয়ে যাওয়া সম্পদ হয়ে থাকে, তাহলে কাছে থাকা সম্পদটুকুর যাকাত আদায় করে দিবে। আর যাকাত অস্বচ্ছল ব্যক্তির কাছে থাকা ঋণ, ছিনতাইকৃত এবং কষ্টের উপার্জিত সম্পদেও ওয়াজিব হবে, যখন মালিকানায় ফেরত পাবে, যা আলী ও ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে ব্যাপক অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

যখন কেউ কোন সম্পদ অর্জন করে, তখন তাতে এক বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না, তবে চারণভূমিতে বিচরণকারী পশুর বাচ্চা ও ব্যবসার্জিত মুনাফার বিষয়টি ভিন্ন (যা পূর্বের সম্পদের সাথে নিসাবরূপে মিশে যাবে), দলীল হল উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বক্তব্য: ***"তাদের মেষশাবককে (নিসাবের পরিমাণ নির্ধারণে) গণনা করো; কিন্তু তা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করো না।"*** এটি মালেক বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বক্তব্যও দলীল। আর তাদের বিপরীত সাহাবাগণের কোনো মত পাওয়া যায়নি। অর্জিত সম্পদ পূর্ব হতে হাতে থাকা সম্পদের সাথে মিশিয়ে একত্রে উভয়টির যাকাত আদায় করতে হবে যদি উভয়টি একই জিনস বা শ্রেণীর অথবা একই মানের সম্পদ হয়, যেমন রুপা ও স্বর্ণ। আর যদি অর্জিত সম্পদটি নিসাবের সম্পদের শ্রেণীর বা একই মানের সম্পদ না হয়, তাহলে অর্জিত সম্পদের যাকাত পৃথকভাবে এবং পৃথক সময়ে আদায় করতে হবে।

অধ্যায়: (হালাল) চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত

যাকাত শুধুমাত্র সায়েমা পশুর ক্ষেত্রেই ওয়াজিব হবে, সায়েমা হল এমন বিচরণকারী পশু, বছরের অধিকাংশ সময় মুক্তভাবে বিচরণ করে এবং নিজে নিজে ঘাস খায়, সুতরাং যদি কোন পশুর জন্য খাবার জমা বা ক্রয় করতে হয়, তাহলে তাতে যাকাত আসবে না। সায়েমা পশু তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: উট, এই উটের সংখ্যা যখন পাঁচটি হবে, তখন তাতে একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। দশটি হলে দুইটি বকরী, পনেরোটি হলে তিনটি বকরী, বিশটি হলে চারটি বকরী, এই সকল ক্ষেত্রে ঐকমত্য রয়েছে। যদি এর সংখ্যা পঁচিশটি হয়, তাহলে এতে একটি বিনতু মাখাদ্ব তথা এক বছরের উটনী প্রযোজ্য হবে। যদি এক বছরের উটনী পাওয়া না যায়, তাহলে এই ক্ষেত্রে একটি ইবনে লাবুন তথা দুই বছরের একটি উট যথেষ্ট হবে। ছত্রিশটি উটের ক্ষেত্রে একটি বিনতু লাবুন তথা দুই বছরের একটি উটনী, আর ছেচল্লিশটি উটের ক্ষেত্রে একটি হিক্কাহ তথা তিন বছরের উটনী, একষট্টিটি উটের ক্ষেত্রে একটি জাযা'আ তথা চার বছরের উটনী, ছিয়াত্তরটি উটের ক্ষেত্রে দুইটি বিনতু লাবুন আর একানব্বইটি উটের ক্ষেত্রে দুইটি হিক্কাহ, একশত একুশটি উটের জন্য তিনটি বিনতু লাবূন দিতে হবে। এরপরে হিসাব দাড়িয়ে যাবে, প্রতিটি চল্লিশের জন্য একটি করে বিনতু লাবূন আর পঞ্চাশের জন্য একটি করে হিক্কাহ। যদি উটের সংখ্যা দুইশতে পৌঁছে যায়, তাহলে দুইটি হিসাব সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যাবে, যদি চায় তাহলে চারটি হিক্কাহ প্রদান করবে, আর চাইলে পাঁচটি বিনতু লাবুন প্রদান করবে।

দ্বিতীয় প্রকার: গরু, এই জাতীয় পশুর ক্ষেত্রে ত্রিশটি না হওয়া পর্যন্ত কোন যাকাত ওয়াজিব হয় না। ত্রিশটি গরুতে এক বছরের একটি তাবী' অথবা তাবী'আ ওয়াজিব হবে, আর চল্লিশটি গরুতে একটি মুসিন্না, যার বয়স দুই বছর, ষাটটি

গরুর ক্ষেত্রে দুইটি তাবী'আ এরপরে প্রত্যেক ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী'। আর প্রত্যেক চল্লিশটি গরুতে মুসিন্না।

তৃতীয় প্রকার: মেষ বা বকরী, এই জাতীয় পশুর ক্ষেত্রে চল্লিশটি না হওয়া পর্যন্ত কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। চল্লিশটি থেকে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি বকরী ওয়াজিব হবে, যদি একশ বিশটির একটি বেশী হতে দুইশত পর্যন্ত বকরী থাকে, তাহলে তাতে দুইটি বকরী ওয়াজিব হবে। যদি দুইশটির চেয়ে একটি বকরী বেশী থাকে, সেখান থেকে তিনশত পর্যন্ত তিনটি বকরী ওয়াজিব হবে।

আর তিনশত পূর্ণ হলে চারটি বকরী ওয়াজিব হবে। এরপরে প্রতিটি একশত এর জন্য একটি করে বকরী। পুং ছাগল, বয়স্ক বকরী এবং ত্রুটিযুক্ত বকরী গ্রহণ করা হবে না, সন্তান লালনকারীনী মাতা বকরী, গর্ভধারিণী, মেদবহুল এবং সর্বোউৎকৃষ্ট বকরীকে গ্রহণ করা হবে না। যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: *"কিন্তু যাকাত নেওয়া হবে তোমাদের মধ্যম মানের সম্পদ থেকে, কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ দাবি করেননি এবং তোমাদেরকে সবচে নিম্নমানের সম্পদ প্রদান করারও নির্দেশ দেননি।"* হাদীসটি আবু দাঊদ বর্ণনা করেছেন। গবাদিপশুসমূহের ক্ষেত্রে একত্রে অবস্থান দুই ধরণের সম্পদকে এক ধরণে রূপান্তরিত করে দেয়।

অধ্যায়: যমীন থেকে উৎপন্ন ফসলের যাকাত

গুদামজাত করা যায় এমন খাদ্যের প্রত্যেকটি মিকয়ালের (শস্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ) ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দুইটি শর্তে যাকাত ওয়াজিব হবে,

প্রথম শর্ত: শস্যটি নিসাব পরিমাণ তথা পাঁচ ওয়াসাক হওয়া – এক ওয়াসাক হল ষাট ছা', এক বছরে উৎপাদিত ফল ও শস্য একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ করতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত: যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় নিসাবের উপরে মালিকানা থাকতে হবে, সুতরাং টোকাই ব্যক্তির অর্জিত সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অথবা যা কাউকে দান করা হয়, অথবা যা কোন শ্রমিককে ফসল কাটার জন্য দেওয়া হয়, আর 'উশর (উৎপাদিত শস্যের এক দশমাংশ) ওয়াজিব হবে এমন যমীনে, যেখানে কোনো প্রকার যোগান ছাড়াই পানি সিঞ্চন করা সম্ভব হয়। আর যেখানে যোগানের প্রয়োজন হয় সেই যমীনে অর্ধেক উশর ওয়াজিব হয়, আর যেখানে যোগান কখনো প্রয়োজন হয় আবার কখনো প্রয়োজন হয় না সেখানে উশরের তথা এক দশমাংশের তিন চতুর্থাংশ। যদি যোগানসহ পানি ও যোগান ছাড়া পানির পরিমাণ কমবেশী হয়, তাহলে যেটার কারণে অধিক লাভ হবে সেটার নিয়মানুসারে যাকাত দিতে হবে আর এটার পরিমাণ নির্ণয় করতে না পারলে উশর ওয়াজিব হবে। শস্যদানার যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে সেটাকে পরিশুদ্ধ করে দিতে হবে আর ফল-মূলের ক্ষেত্রে সেটাকে শুকনা অবস্থায় দিতে হবে।

যাকাত ও সদকার সম্পদ ক্রয় করে নেওয়া তার (যাকাত আদায়কারীর) জন্য সহীহ হবে না, হ্যাঁ, তবে সেগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পুনরায় তার নিকট এসে পৌঁছালে তার জন্য গ্রহণ করা জায়েয হবে। শাসক একজন অনুমানকারীকে সাথে পাঠাবে। এ ক্ষেত্রে একজনই যথেষ্ট। অনুমানকারী ঐ ব্যক্তি ও তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয় এই পরিমাণ পাকা ফল ছেড়ে দিবে। যদি সে ছেড়ে না দেয়, তাহলে সম্পদের মালিকের জন্য তা নিজের কাছে রেখে দেওয়া জায়েয আছে। ইমাম আহমাদ রাত্রিবেলা ফসল কাটা ও উপড়ানোকে মাকরূহ বলেছেন। উশরের যমীনে উৎপাদিত ফসলের যাকাত বারবার দিতে হয় না; যদিও উৎপাদিত শস্য বছরের

পর বছর যাবৎ অবশিষ্ট থাকুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ব্যবসার পণ্য না হবে। ব্যবসার পণ্য হলে প্রত্যেক বছরে একবার করে যাকাত দিতে হবে।

অধ্যায়: স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত

সোনার নিসাব হল বিশ মিছকাল। রুপার নিসাব হল দুইশত দিরহাম। এই পরিমাণ সম্পদের মাঝে এক দশমাংশের এক চতুর্থাংশ (২.৫%) পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হবে, নিসাব পূর্ণ করণের ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির সাথে যোগ করে নিতে হবে, আর অন্যান্য ব্যবসায়ী পণ্যগুলোর মূল্যকে উভয়টির সাথে যোগ করে নিতে হবে। ব্যবহৃত অলঙ্কারে কোন যাকাত নেই, যদি সেগুলোকে ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করা হয়, তাহলে সেগুলোতে যাকাত প্রযোজ্য হবে। আর পুরুষের জন্য রুপার আংটি অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার বৈধ, যা বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে পরিধান করা সর্বোত্তম। ইমাম আহমাদ ডান হাতে আংটি পরিধানের মতকে দুর্বল বলেছেন। পুরুষ ও নারীর জন্য লোহা, তামা ও পিতলের আংটি ব্যবহার মাকরূহ, যা তার থেকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। রুপা দ্বারা তরবারির হাতল ও বেল্ট-বন্ধনীকে অলঙ্কার খচিত করা জায়েয আছে; যেহেতু সাহাবীগণ – রদিয়াল্লাহু আনহুম – রৌপ্য খচিত কোমর বন্ধনী ব্যবহার করতেন। আর মহিলাদের জন্য তাদের পরিধানের অভ্যাস-রীতি অনুযায়ী পরিমিত স্বর্ণ ও রোপার অলঙ্কার পরিধান বৈধ। পোশাক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য নারীর সঙ্গে ও নারীর জন্য পুরুষের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখা হারাম।

অধ্যায়: ব্যবসায়িক পণ্য সামগ্রীর যাকাত

ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্যে যাকাত ওয়াজিব হবে যখন তা নিসাব পরিমাণ হবে, যখন তা সামগ্রীগুলো ব্যবসায়িক সামগ্রী হয়। যে সকল স্থাবর সম্পত্তি ও পশু ভাড়া দিয়ে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে যাকাত আসবে না।

অধ্যায়: যাকাতুল ফিতর

এটা হল অনর্থক ও অশ্লীলতাপূর্ণ বিষয় থেকে সিয়াম পালনকারীর পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম। এটা প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ফরযে 'আইন যদি তার নিকটে ঈদের দিন ও ঈদের রাত্রিতে তার এবং তার পরিবারের খাদ্যের অতিরিক্ত খাদ্য অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তার ও তার অধীনস্ত মুসলিমদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে তাকে এক সা' পরিমাণ খাবার সদকা করতে হবে, তবে তার শ্রমিকের পক্ষ থেকে তাকে আদায় করতে হবে না। যদি সকলের পক্ষ থেকে আদায় করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করবে এরপরে যে সর্বাধিক নিকটতম, এরপরে যে সর্বাধিক নিকটতম। গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব নয়। যে কোন মুসলিমের রমাদান মাসের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তার উপরে তার ফিতরা আদায় করাও আবশ্যক হবে। ঈদের এক বা দুই দিন পূর্বে ফিতরা আদায় করা জায়েয আছে, তবে ঈদুল ফিতরের দিনের পরে বিলম্ব করা জায়েয নেই। যদি কেউ বিলম্ব করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তাকে কাযা আদায় করে নিতে হবে। আর এটা আদায়ের সর্বোত্তম সময় হল ঈদের দিন সালাতের পূর্বে, আর ওয়াজিব হল এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা গম অথবা কিশমিশ অথবা যব অথবা পনির। যদি এগুলো না থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট শহরের প্রচলিত খাদ্য দ্বারা আদায় করবে। ইমাম আহমাদ পরিশুদ্ধ খাঁটি খাবার দেওয়া পছন্দ করতেন, তিনি এই মত ইবনু সীরীন থেকে

বর্ণনা করেছেন। এক জমাতকে একজনের ফিতরা দেওয়া বা তার বিপরীত কয়েক জনের ফিতরা একজনকে দেয়া জায়েয।

অধ্যায়: যাকাত আদায় করার সময়

যাকাত নির্দিষ্ট সময়ে আদায়ের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিলম্বে আদায় করা জায়েয নেই। তবে শাসক বা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকলে ভিন্ন কথা। এমনিভাবে যাকাতের পণ্য সামগ্রী বাহকের জন্য দুর্ভিক্ষ ও অনাহার জাতীয় ওযরের কারণে জায়েয আছে সেগুলোকে মালিকের কাছ থেকে গ্রহণে বিলম্ব করা। ইমাম আহমদ এই বিষয়ে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কর্ম দ্বারা দলীল দিয়েছেন।

অধ্যায়: যাকাত হকদার

তারা মোট আট শ্রেণির: যেগুলো বাদ দিয়ে অন্য কোথাও যাকাতের সম্পদ প্রদান করা জায়েয নেই। যেহেতু এক্ষেত্রে আয়াত রয়েছে:

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি হল: ফকীর ও মিসকীন। যতটুকু প্রয়োজন তা থাকলে চাওয়া জায়েয নেই। পান করার জন্য পানি চাওয়া, ধার চাওয়া ও ঋণ চাওয়ার অনুমতি তার আছে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে আহার করানো, নগ্ন ব্যক্তিকে পোশাক পরিধান করানো ও বন্দীকে মুক্ত করা ওয়াজিব।

তৃতীয় শ্রেণি: যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীগণ, যেমন: ফসল কর্তনকারী, লেখক, গণনাকারী, পরিমাপকারী। নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে যাকাত আদায়ের কর্মচারী নির্বাচন জায়েয নেই। যদি ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক) চান তাহলে তিনি তাকে পূর্ব চুক্তি ছাড়া প্রেরণ করতে পারেন, আর তিনি

চাইলে তার জন্য কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ তাকে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেও দিতে পারেন।

চতুর্থ শ্রেণি: ঐ সকল ব্যক্তি, যাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করা হয়। যারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ে মান্যবর ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, যারা কাফের; কিন্তু তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় অথবা মুসলিম; কিন্তু এই দানের মাধ্যমে তার ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি অথবা তার সমমানের নেতৃবর্গের ইসলাম গ্রহণ অথবা তার নসীহত আশা করা হয় অথবা তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে করা হয়। মুসলিম ব্যক্তিকে তার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য তাকে যেই ঘুষ দেওয়া হয়, তা তার জন্য নেওয়া জায়েয নেই।

পঞ্চম শ্রেণি: দাস সম্প্রদায়, তারা হল মুকাতাব (অর্থের বিনিময়ে আযাদ হওয়ার ব্যাপারে মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ) গোলাম। যাকাতের অর্থ দ্বারা কাফেরদের হাতে বন্দী মুসলিম ব্যক্তির মুক্তিপণ দেওয়া জায়েয আছে। কারণ এটা হল ক্রীতদাস আযাদ করার ন্যায়, আর এই অর্থ দ্বারা কোনো গোলামকে সরাসরি ক্রয় করে আযাদ করে দেওয়াও জায়েয আছে; যেহেতু আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীটি ব্যাপক: অর্থ:

﴿ ...وَفِي ٱلرِّقَابِ... ﴾[التوبة: 60]

“এবং ক্রীতদাস আযাদ করার ক্ষেত্রে।”

ষষ্ঠ শ্রেণি: যারা ঋণগ্রস্ত, এরা দুই প্রকার: এক; যারা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসনের স্বার্থে ঋণগ্রস্ত হয়েছে, অর্থাৎ যে ঝগড়া-বিবাদ শান্ত করণের লক্ষ্যে নিজের থেকে সম্পদ ব্যয় করেছে। দুই; যে কোনো বৈধ কাজে নিজের জন্য ঋণ নিয়েছে।

সপ্তম শ্রেণি: আল্লাহর রাস্তায় যারা আছেন, তারা হলেন যোদ্ধা, তাদেরকে যুদ্ধের মাঠে যথেষ্ট হয় এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করা, যদিও তারা সামর্থ্যবান হন। আর হজ্জও আল্লাহর রাস্তার মধ্যে গণ্য হবে।

অষ্টম শ্রেণি: পথচারী, ঐ অসহায় মুসাফির, যার কাছে নিজ শহরে যাওয়ার মত কোনো পাথেয় নেই। সুতরাং তাকে এই পরিমাণ সম্পদ দেওয়া যাবে, যা তাকে তার নিজ শহরে পৌঁছে দেয়, যদিও সে নিজ শহরে অনেক বড় ধনী হোক না কেন। যদি এমন ব্যক্তি দরিদ্র হওয়ার দাবি করে, যার স্বচ্ছলতা সম্পর্কে জানা নেই, তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি এই ব্যক্তি স্বাস্থ্যবান হয়, আর তার পেশা সম্পর্কে জানা যায়, তাহলে তাকে দেওয়া জায়েয নেই। আর যদি তার পেশা সম্পর্কে জানা না যায়, তাহলে তাকে এই অর্থ দেওয়া হবে এই সংবাদ দেওয়ার পরে যে, "এই অর্থের মধ্যে কোনো ধনী এবং কোনো সামর্থ্যবান উপার্জনকারীর জন্য কোনো অংশ নেই।" আর যদি দূরের ব্যক্তির প্রয়োজন অধিক হয়, তবে আত্মীয়কে না দিয়ে দূরের ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে এবং এই ক্ষেত্রে আত্মীয়কে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। যাকাতের দ্বারা নিজের থেকে কোনো অপবাদ প্রতিহত করা যাবে না। এর বিনিময়ে কারো থেকে সেবা নেওয়া যাবে না এবং এই অর্থ নিজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। নফল সদকা সর্বাবস্থায় সুন্নাত, গোপনে দান করা সর্বোত্তম। এমনিভাবে সুস্থাবস্থায় মনের খুশিতে এবং রমাদান মাসে সর্বোত্তম, যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** এই সময়ে তা করেছেন, এবং প্রয়োজনের সময়ও যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿... فِي يَوۡمٖ ذِي مَسۡغَبَةٖ﴾[البلد: 14]

"অনাহারের দিনে।" এটা হল নিকটাত্মীয়ের ক্ষেত্রে সদকা এবং সম্পর্ক রক্ষা বলে বিবেচিত হবে, বিশেষভাবে বিবাদ থাকাকালে; যেহেতু নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি**

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: *“যে তোমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সেই সম্পর্ক জোড়া লাগিয়ে দাও।”* এরপরে প্রতিবেশী; দলীল হল আল্লাহ তা’আলার বাণী:

﴿ ... وَٱلۡجَارِ ذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ... ﴾[النساء: 36]

“আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশী।”

আর যার প্রয়োজন অনেক বেশী হবে;

যেহেতু আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

﴿أَوۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَةٖ﴾ [البلد:16]

“অথবা হতদরিদ্র ব্যক্তিকে।” কোন ব্যক্তি এই পরিমাণ সদকা করবে না যাতে নিজের অথবা নিজের ঋণদাতার অথবা অধীনস্তদের ক্ষতি হয়। যে ব্যক্তি নিজের উত্তম তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জানে এবং তারই উপার্জনে তার পরিবারের ব্যয়ভার সরবরাহ যথেষ্ট হয়, এমন ব্যক্তি যদি নিজের সমস্ত সম্পদ সদকা করে দেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তা মুস্তাহাব হবে; যেহেতু এই বিষয়ে আবূ বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ঘটনার দ্বারা দলীল পাওয়া যায়। অন্যথায় এটা জায়েয হবে না; বরং তার উপরে সদকার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেওয়া হবে। যে দারিদ্রতা সহ্য করতে পারে না তার জন্য নিজের পূর্ণ ব্যয়ভার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা মাকরূহ, সদকা দিয়ে খোটা দেওয়া হারাম ও কাবীরা গুনাহ, যা সদকার ছাওয়াবকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়। যে সদকা করার উদ্দেশ্যে কিছু সম্পদ নির্ধারিত করে রাখল, এরপরে কোন সমস্যার কারণে তা বাধাগ্রস্থ হল, তার জন্য মুস্তাহাব হল উক্ত সদকা কার্যকর করে দেয়া। ‘আমর ইবনুল ‘আস

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন কোনো ভিক্ষুকের জন্য খাবার ধার্য করতেন; কিন্তু কাউকে খুঁজে পেতেন না, তখন সেই খাদ্য তিনি আলাদা করে রাখতেন। আর উন্নত মানের খাদ্য সদকা করবে। কোনো মন্দ বা ভেজাল বস্তু দানের নিয়্যাত করা যাবে না। সর্বোত্তম সদকা হল দরিদ্র ব্যক্তির কষ্টার্জিত সম্পদ। এই কথার সঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসের কোনো বিরোধ নেই: ***“উত্তম সদকা হল যা স্বচ্ছলতা থেকে দেওয়া হয়।”*** এখানে উদ্দেশ্য হল দরিদ্র ব্যক্তির কষ্টার্জিত ঐ সম্পদ, যা তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণের পরে দান করা হয়।

অধ্যায়: সিয়াম

রমাদানের সিয়াম ইসলামের একটি অন্যতম রুকন। এটি দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। আল্লাহর রাসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** নয়টি রমাদানে সিয়াম পালন করেছেন। শা‘বান মাসের ত্রিশ তারিখের রাত্রিতে নতুন চাঁদ দেখতে যাওয়া মুস্তাহাব। রমাদান মাসের সিয়াম ওয়াজিব হয় উক্ত মাসের নতুন চাঁদ দেখার দ্বারা। যদি আকাশ অস্পষ্ট থাকার কারণে দেখা না যায়, তাহলে ত্রিশদিন পূর্ণ করবে, এরপরে কোন মতানৈক্য ছাড়াই সকলে সিয়াম রাখা শুরু করবে। আর চাঁদ দেখা গেলে তিনবার তাকবীর দিয়ে এই দু‘আ পাঠ করবে: ***“হে আল্লাহ, এই চাঁদকে উদিত করো আমাদের জন্য নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি, ইসলাম ও তোমার পছন্দ ও সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দিয়ে। আমার আর তোমার রব আল্লাহ, এই চাঁদ কল্যাণ ও সততার প্রতীক।”*** চাঁদ দেখার বিষয়ে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও সে একাকী দেখে থাকে। আর যদি তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে তার জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক। তবে সিয়াম রাখা বন্ধ করবে মানুষের সাথে। আর যদি

সে একাকী শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখতে পায়, তাহলে সিয়াম রাখা বন্ধ করবে না, যা ইমাম তিরমিযী অধিকাংশ আলেমদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর মুসাফির যখন নিজ গ্রামের বসতি থেকে দূরে চলে আসবে তখন সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে; তবে অধিকাংশ আলেমগণের মতানৈক্য থেকে বের হয়ে আসার জন্য সিয়াম পূর্ণ করাই তার জন্য অধিক উত্তম। আর গর্ভধারিণী ও দুধদানকারী মাতার জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ, যখন তারা উভয়ে নিজের ওপর অথবা তাদের সন্তানের ওপর ভয় করবে। যদি তাদের সন্তানের ওপর কোনো আশংকা করে, তাহলে প্রত্যেকটি সিয়ামের বিপরীতে একজন মিসকীনকে আহার করাবে।

আর অসুস্থ ব্যক্তি যদি কোনো ক্ষতির আশংকা করে, তাহলে তার জন্য সিয়াম রাখা মাকরূহ হবে, এ বিষয়ে বর্ণিত আয়াতের ভিত্তিতে। আর যে ব্যক্তি বার্ধক্যজনিত অথবা সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না এমন অসুস্থতাজনিত কারণে সিয়াম রাখতে অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে সে সিয়াম রাখবে না এবং প্রত্যেক সিয়ামের বিপরীতে একজন মিসকীনকে আহার করাবে। আর যদি কারো মুখে অনিচ্ছায় কোনো মাছি অথবা ধুলাবালি ঢুকে পড়ে অথবা পানি প্রবেশ করে, তাহলে তার সিয়াম ভঙ্গ করবে না।

ফরয সিয়াম রাত্রে নিয়ত না করলে বিশুদ্ধ হবে না। আর নফল সিয়াম দিবসে নিয়ত করলেও সহীহ হবে, সূর্য মধ্যাকাশ থেকে ঢলে যাওয়ার পূর্বে হোক বা পরে, (তবে দিনের শুরুতে সিয়াম ভঙ্গকারী কিছু পাওয়া না যেতে হবে)।

অধ্যায়: সিয়াম ভঙ্গের কারণসমূহ

যে ব্যক্তি কোন খাদ্য খেয়ে ফেলে বা পান করে অথবা তেল বা অন্যকিছুর ঘ্রাণ নেয়, এরপরে তা তার কন্ঠনালীতে পৌঁছে যায় অথবা ইনজেকশন নেয় অথবা

ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে অথবা শিঙ্গা লাগায় অথবা শিঙ্গা দ্বারা চিকিৎসা প্রদান করে, তাহলে তার সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। আর ভুলে যাওয়া ব্যক্তির সিয়াম এগুলোর কোনটির দ্বারাই ভাঙবে না। ফজর উদিত হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হলে পানাহার জায়েয আছে, যেহেতু আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:187]

“তোমরা খাও এবং পান করো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিকট সাদা সুতা থেকে কালো সুতা স্পষ্ট না হয়।” আর যে ব্যক্তি সহবাসের মাধ্যমে সিয়াম ভঙ্গ করল, তার উপরে কাযাসহ যিহারের কাফফারা ওয়াজিব। আর যার যৌন চাহিদা অধিক সংবেদনশীল তার জন্য চুমু দেওয়া মাকরূহ। সর্বদা মিথ্যা, গীবত, গালিগালাজ এবং পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব; কিন্তু সিয়াম পালনকারীর জন্য এটা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা সুন্নাত, যদি তাকে কেউ গালি দেয় সে যেনো বলে: “আমি সিয়াম পালনকারী।” ইফতারি দ্রুত শুরু করা সুন্নাত, যখন সূর্যাস্ত নিশ্চিত হয়ে যায়। আবার প্রবল ধারণার ভিত্তিতেও ইফতারি শুরু করার অনুমতি আছে। সাহরি দেরিতে করা সুন্নাত; যতক্ষণ পর্যন্ত ফজর উদিত হওয়ার ভয় না থাকে। সাহরির ফযীলত পানাহারের দ্বারাই অর্জিত হয়ে যাবে, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়। ইফতারি তাজা খেজুর দিয়ে করবে, যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে শুকনা খেজুর দ্বারা, যদি তাও না পাওয়া যায়, তাহলে পানি দ্বারা। ইফতারির সময় দু‘আ করবে। যে ব্যক্তি কোনো একজন সিয়ামপালনকারীকে ইফতার করাবে, সে তার সিয়ামের সমপরিমাণ ছাওয়াব পাবে। রমাদান মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত, যিকর এবং দান-সদকা করা উত্তম। সর্বোত্তম

নফল সিয়াম হল একদিন সিয়াম রাখা আর একদিন সিয়াম না রাখা। প্রত্যেক মাসে তিনদিন সিয়াম রাখা সুন্নাত, আর এই ক্ষেত্রে আইয়্যামুল বীদ্ব (আরবী মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ) সর্বোত্তম। বৃহস্পতিবার, সোমবার এবং শাওয়াল মাসের ছয় দিন –পৃথক পৃথক ভাবে হলেও– এবং যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম নয়দিন সিয়াম রাখা সুন্নাত, এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল নবম যূল হিজ্জাহ, যা আরাফার দিবস মুহাররম মাসের সিয়াম আর তার সর্বোত্তম সিয়াম হল নবম ও দশম তারিখ, উভয় দিনের সিয়াম রাখা সুন্নাত। আর আশূরার দিবসে সিয়াম ব্যতীত যত আমলের কথা উল্লেখ করা হয়, সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই; বরং সেগুলো বিদ'আত। রযব মাসের জন্য বিশেষভাবে কোন সিয়াম রাখা মাকরূহ। এই মাসের জন্য বিশেষ কোন সিয়াম ও সালাতের ফযীলত সম্পর্কিত যত হাদীস আছে, তার সবগুলো মিথ্যা। শুধুমাত্র জুমু'আর দিনে আলাদাভাবে সিয়াম রাখা মাকরূহ। রমাদান মাসের এক বা দুইদিন আগে সিয়াম রাখা মাকরূহ। আস-সাওমুল বিসাল (ইফতারি না করে অবিরাম সিয়াম রাখা) মাকরূহ। দুই ঈদের দিন এবং তাশরীকের দিনগুলোতে সিয়াম রাখা হারাম। আর সাওমুদ দাহর তথা বিরতিহীনভাবে প্রত্যেক দিন সিয়াম রাখা মাকরূহ।

লাইলাতুল কদর অত্যন্ত মহিমান্বিত রাত। এই রাতে দু'আ কবূল হওয়ার আশা করা যায়; যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [سورة القدر : 3]

"লাইলাতুল-কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" মুফাসসিরগণ বলেছেন: লাইলাতুল কদরে কিয়াম ও অন্যান্য আমল করা হাজার মাসে কিয়াম করা হতে অধিকতর উত্তম। এ রাতকে লাইলাতুল কদর নামে নামকরণ করা হয়েছে; কেননা উক্ত বছরে যা কিছু সংঘটিত হবে তা এই রাতে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

এ রাতের বিশেষ সময় হচ্ছে রমাদানের শেষ দশদিন এবং বেজোড় রাতসমূহ।

সবচেয়ে বেশী তাকিদপ্রাপ্ত রাত হচ্ছে সাতাশতম রাত। আর এ রাতে নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে যে দু‘আ শিখিয়েছেন তা পাঠ করবে: *“হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আপনি ক্ষমা করকে পছন্দ করেন। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।”* আল্লাহই সর্বোজ্ঞ। **আল্লাহ রহমত ও শান্তি নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও তার সাহাবীগণের উপর।**

সালাতের বিধিবিধান

লেখক: শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

সালাতের শর্তসমূহ নয়টি:

ইসলাম (তথা মুসলিম হওয়া), বোধসম্পন্ন হওয়া, তামঈয তথা বিবেচনা সম্পন্ন হওয়া, অপবিত্রতা হতে মুক্ত হওয়া, সতর ঢাকা, নাপাকী দূর করা, সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাপারে জানা, কিবলার দিকে মুখ ফিরানো এবং নিয়ত করা ও দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া।

সালাতের চৌদ্দটি রুকন রয়েছে:

সামর্থ থাকলে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা, তাকবীরে তাহরীমা বলা, সূরা ফাতিহা পড়া, রুকু করা, রুকু থেকে ওঠা, ধীরস্থির হয়ে দাঁড়ানো, সিজদা করা,

সিজদা হতে ওঠা, দুই সিজদার মাঝে বসা, প্রতিটি কাজ ধীরে প্রশান্তচিত্তে করা, তারতীব (ধারাবাহিকতা) রক্ষা করা, শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ পড়া, শেষ বৈঠক করা এবং প্রথম সালাম ফিরানো।

সালাতকে বাতিলকারী বিষয় আটটি:

ইচ্ছাকৃত কথা বলা, হাসা, খাওয়া, পান করা, সতর খুলে যাওয়া, কিবলার দিক থেকে মুখ ঘুরে যাওয়া, অধিক পরিমাণে নিরর্থক (সালাত বহির্ভূত) কাজ করা এবং অপবিত্র হওয়া।

সালাতের ওয়াজিব আটটি:

প্রথম: তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য তাকবীরগুলি বলা। দ্বিতীয়: ইমাম ও একাকী ব্যক্তির ক্ষেত্রে

‘سمع الله لمن حمده’

তথা “যে আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রশংসা শোনেন’ এ কথা বলা।

তৃতীয়:

‘ربنا ولك الحمد ’

বা ‘রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ (হে আমদের রব! আপনারই যাবতীয় প্রশংসা)’ বলা। চতুর্থ: রুকুর তাসবীহ পড়া। পঞ্চমত: সিজদার তাসবীহ পড়া।

ষষ্ঠত:

‘رب اغفر لي ’

বা "হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন' দুই সিজদার মাঝখানে কমপক্ষে একবার বলা ওয়াজিব।

সপ্তমত:প্রথম তাশাহহুদ পড়া; কেননা নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** এটি করেছেন ও এটিকে সর্বদায় করতেন, এটির আদেশ দিয়েছেন, এটি ভুলে গেলে সিজদায়ে সাহু করেছেন। অষ্টমত: প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক করা।

অযুর ফরয ছয়টি:

সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা, দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়া, সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা, পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত দুই পা ধোয়া, তারতীব রক্ষা করা এবং একটির পরে অন্যটি দ্রুত সম্পন্ন করা।

অযুর শর্ত পাঁচটি:

পবিত্র পানি, ব্যক্তির মুসলিম ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, কোনোরূপ বাধা না থাকা, চামড়াতে পানি পৌঁছা এবং সবসময় নাপাক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সালাতের ওয়াক্ত হওয়া।

অযু ভঙ্গের কারণ আটটি:

প্রসাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া, শরীর থেকে কোনো নোংরা বস্তু বের হওয়া, ঘুম বা অন্য কোনো কারণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলা, কামনার সাথে নারীকে স্পর্শ করা, মানুষের দুই গোপনাঙ্গ স্পর্শ করা, মৃতকে গোসল করানো, জবাইকৃত উটের গোশত খাওয়া এবং ইসলাম ত্যাগ করা, আল্লাহ

আমাদের সকলকে মুরতাদ হওয়া থেকে রক্ষা করুন! আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ: সালাতের উদ্দেশ্যে হাঁটার আদাব 4

পরিচ্ছেদ: সালাতের পদ্ধতি 7

অধ্যায়: নফল সালাত...31

অধ্যায়: জামা‘আতে সালাত আদায় 43

অধ্যায়: উযরগ্রস্তদের সালাত 51

অধ্যায়: জুমু‘আর সালাত...54

অধ্যায়: দুই ঈদের সালাত..56

অধ্যায়: সূর্যগ্রহণের সালাত 57

অধ্যায়: বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত 58

অধ্যায়: জানাযা...61

অধ্যায়: যাকাত..69

অধ্যায়: (হালাল) চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত...71

অধ্যায়: যমীন থেকে উৎপন্ন ফসলের যাকাত..................................72

অধ্যায়: স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত 74

অধ্যায়: ব্যবসায়িক পণ্য সামগ্রীর যাকাত 75

অধ্যায়: যাকাতুল ফিতর 75

অধ্যায়: যাকাত আদায় করার সময় 76

অধ্যায়: যাকাত হকদার 76

অধ্যায়: সিয়াম..80

অধ্যায়: সিয়াম ভঙ্গের কারণসমূহ..81
সালাতের বিধিবিধান..84
সুচিপত্র 88

موسوعة القرآن الكريم
QuranEnc.com
موسوعة تضم تفاسير وتراجم موثوقة لمعاني القرآن الكريم

موسوعة الأحاديث النبوية
HadeethEnc.com
موسوعة تضم ترجمات للأحاديث النبوية وشروحها بعدة لغات

موسوعة المصطلحات الإسلامية
TerminologyEnc.com
موسوعة تضم ترجمات المصطلحات الإسلامية وشروحها بعدة لغات

تنشر الإسلام بأكثر من 100 لغة

Islamhouse.com

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٢١
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH